নবম বার্ষিক পত্রিকা

With Best Compliments from

TMC INSTITUTE OF LEARNING

H.O. & Workshop	**Study Centre**
39/3, Canal West Road Kolkata 700004 Ph. 033 25556842 Fax 033 25335528 e-mail : tmcil@tmcgroupindia.com	Sudha Abasan Ground Floor (NW) 12/2, Dakshin Para Road Kolkata 700 028 Ph. 09748906685 (Mob.)

A NAME TO RECKON WITH FOR

★ **Vocational Level Courses**

On Industrial Practices in the fields of (a) Heat Treatment and (b) Non Destructive Testing (NDT) of Metals

Approved by Jadavpur University

Of Six Months duration tailor made & highly recommended for persons who could not continue education after Madhyamik and awaiting for job opportunity in industry as well as for experienced persons with inadequate academic background

Backed by thorough theoretical input & shop floor practices

Moderate fees

Golden opportunity : For candidates registered with Employment Exchange, 50% of course fee will be subsidized by Govt. of West Bengal.

★ **Short Term Courses and workshops**

In association with leading Educational Institutions & professional bodies in the fields of Heat Treatment & Non Destructive Testing (NDT) of metals

Recommended for Engineering Graduates & Diploma holders

সম্পাদকীয়

নতুন বছরে বিগত চার বছরের মতন 'সাঁকো'র নবম সংখ্যা পৌঁছে যাবে ২০১২-র TMC Group-এর ক্যালেন্ডারের সাথে আমাদের শুভাকাঙ্খী ও সদস্যদের হাতে। আজকের ইংরাজী কালেন্ডারের শুরু দু'হাজার পঞ্চাশ বছরের কিছু আগে আর শেষ জানা নেই। পৃথিবীর সূর্যকে একপাক ঘোরা সম্পূর্ণ হলে নতুন বাৎসরিক কালেন্ডার এসে পড়ে আমাদের জীবনে। যাইহোক ধারাবাহিকতা নিয়ে অতি কল্পনা থাক। পত্রিকার বিষয়বস্তুর গভীরতা বা বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে যেতে হবে যাতে লেখক ও পাঠকের মধ্যে ছোট হলেও যে সুন্দর ও সুদৃঢ় পরিমন্ডল তৈরি হয়েছে তা ক্রমবর্ধমান থাকে।

গত বছর আমাদের আপনজনেরা কেউ আমাদের ছেড়ে যাননি। অবসরের পর শম্ভুদা আর. জি. করের কাছে কয়েকমাস আগে অটোর ধাক্কায় রাস্তায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেও কারখানার সদস্যদের সাথে পুলিশ ও পথচারীদের তৎপরতায় সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা হওয়ায় ফের স্বাভাবিক জীবনে ফেরত এসেছেন। আবার অনেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে সরাসরি যুক্ত না হতে পারলেও তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি। পল্লবদার বাবার কাছ থেকে 'অমূল্য' উপহার (স্বরচিত কবিতা) এবারও আমরা পেয়েছি, যা তাঁর শারীরিক অবস্থানুযায়ী আশাতীত ছিল।

প্রবাদ প্রতিম বেশ কয়েকজন শিল্পীকে আমরা হারিয়েছি এই বছরে—রবীন্দ্র সঙ্গীতের 'স্বর্ণকণ্ঠী' সুচিত্রা মিত্র, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পিতৃপুরুষ ভীমসেন যোশী, সিনেমার চিরকুমার 'গাইড' দেব আনন্দ, ভিন্নধর্মী নাট্যধারার রূপকার বাদল সরকার, নৃত্যের 'রানার' শম্ভু ভট্টাচার্য্য, প্রখ্যাত ও বিতর্কিত চিত্রশিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, 'গজলশ্রেষ্ঠ' জগজিত সিং অরোরা, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কার্টুনিষ্ট কুট্টি, সঙ্গীতের 'যাযাবর' ভূপেন হাজারিকা, বলিউডের রোমান্টিক নায়ক শাম্মী কাপুর, টলিউডের হাসিখুশি 'জটায়ু' বিভু ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। এঁদের শিল্পসৃষ্টিগুলি চিরদিনের, মৃত্যুর ক্ষমতা নেই এগুলিকে শেষ করার। তবে সারা বিশ্বের লোক সঙ্গীতের এক পতাকাবাহক উৎপলেন্দু চৌধুরীর অকালমৃত্যু বড়ই বেদনার। এছাড়া ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বকালের কণিষ্ঠ অধিনায়ক মনসূর আলি খান (পাতৌদি) কেও আমরা এই সময়ে হারিয়েছি। দুর্ঘটনায় ওনার একচোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থাতেও তাঁর ব্যাটিং এবং ফিল্ডিং দক্ষতা সারা বিশ্বকে আলোড়িত করেছিল। নবাবী অভিজাত্যের সঙ্গে এক সংবেদনশীল মনের মানুষ ছিলেন। সকলকে শ্রদ্ধা জানাই।

নামকরণ বা নিবন্ধীকরণ পরে হলেও 'সাঁকো'র জন্ম ২০০১ সালে তপনদার স্মরণসভাতে। প্রকাশনার মতনই গান, শ্রুতিনাটকের মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ অজনা একটা দিককে জানতে পেরেছিলাম। বিশ্বাস অর্জন করেছিলাম যে, তাপ প্রক্রিয়াকরণ বা Piling-র জ্ঞান ও দক্ষতার মত আমরা মানুষের মন স্পর্শ করার মত গান নাটকও করতে পারি কারখানার টিনের চালের তলায়। অবশ্যই অগ্রণী কয়েকজন ছিলেন কিন্তু ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল বাকী সাধারণ সদস্যদের অতি প্রিয়জন হারানোর ব্যাথিত হৃদয়ের স্পর্শে। সেই শুরুর পথচলা সময়ের সাথে সাথে অনেকটাই পরিনত হয়েছে। দুঃখের সাথে আনন্দ, প্রতিবাদ, প্রশ্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা—সব মিলিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চার বিষয়বস্তু ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। এই ক'বছরে ছোট, বড় মিলে শ'য়ের উপর মানুষ নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকে অংশ নিয়েছে। এরা সবাই আমাদের আপনজন, কেউ অপরিচিত নয়। দর্শকের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আর এই দর্শকও সব আমাদের পরিচিত। 'ভালতে হাততালি-খারাপে গালাগালি' দেওয়া শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষক দর্শক। শিল্পীদের এক অমূল্য রত্নভান্ডার। সব মিলেয়ে শিল্পচর্চায় 'শত ফুল বিকশিত' হচ্ছে 'সাঁকো'র মধ্যে। সব প্রয়োজনীয় ফুলকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখে নাচ-গান-আবৃত্তি-নাটকের সুন্দর ডালি সমাজে পেশ করতে হবে। আর এই বিষয়েই চিন্তাভাবনা-আলোচনা- বিতর্ক-দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে কয়েক বছর যা শুভ লক্ষণ।

সমাজে অস্থিরতার বিষয়ে বিগত কয়েকটি সংখ্যায় উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকীয়তে। অস্থিরতা অনেক সময় শুভ পরিবর্তনের পূর্বাভাষ দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই আশাতেই মনে হয় বিগত বিধানসভা নির্বাচনে স্পষ্ট পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। দীর্ঘ ৩৪ বছরের টানা বাম শাসনের অবসান হয়েছে। 'মা-মাটি-মানুষ'-র সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু অস্থিরতা কমার প্রাথমিক লক্ষণ তেমন আশাপ্রদ নয়। জিনিষপত্রের দাম অল্প কিছুদিন হল একটু স্থিতিশীল হলেও সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার প্রায় বাইরে ছিল বিগত মাসগুলিতে, অথচ গ্রামে উৎপাদন খরচা বেড়ে গেলেও চাল-আলু-আনাজপাতি-পাটের বিক্রয় মূল্য গত বছরের তুলনায় নিম্নমুখী, ফলে কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা অন্যান্য রাজ্যের মত এখানেও ঘটছে। আমাদের রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার নিম্নমুখী ছিল দু এক দশক, তা পাল্টাচ্ছে—বিগত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে অনেকগুলি শিশুর একসঙ্গে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ঢাকুরিয়ার AMRI হাসপাতালের ঘটনার নিন্দার কোনও ভাষাই বোধহয় যথেষ্ট নয়। এই ঘটনায় ৯৬ জনের মৃত্যুর মাত্র দু এক দিনের মধ্যেই ১৭০-এর বেশি মানুষ (সরকারি হিসেব অনুযায়ী) মারা গেল চোলাই মদের বিষে। জ্ঞানেশ্বরীর আন্তর্ঘাত থেকে যে শবের মিছিল রাজ্যে শুরু হয়েছে, তা কবে শেষ হবে বোঝা যাচ্ছে না। এছাড়া বিদ্যুৎ, রেল, সড়ক পরিবহনের মত অতি আবশ্যিক ও জরুরী পরিষেবাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের হাল দ্রুত নিম্নমুখী হয়ে ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সরকারী সড়ক পরিবহণ সংস্থার কর্মীদের বেতন এবং অবসর প্রাপ্তদের পেনশন অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। পরিবর্তনের নামে ছাত্র ইউনিয়ন বা পরিচালন ব্যবস্থার দখল নেওয়ার প্রয়াস অবশিষ্ট শিক্ষা কাঠামোকে আরও কমজোরি করে তুলছে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকের জমি ফেরত পাবার আশা আইনের জালে মরীচিকায় পরিণত হয়েছে। দার্জিলিঙ সহ পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন হবার আশঙ্কা জোরালো হয়েছে গোর্খাল্যান্ড চুক্তির মধ্য দিয়ে, '৭৭ সালের মত দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির বদলে বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক বন্দীর সংখ্যা বাড়ছে। বিনাবিচার বা অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ার ঘটনাও আছে। রাজনৈতিক আক্রমণ বা হত্যা বন্ধ হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ বেড়ে চলেছে। শিল্পে বিনিয়োগ থমকে পড়েছে। সবমিলিয়ে অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পরিস্থিতিটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে।

আমাদের অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তার মধ্যে পথচলার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, একসাথে নিজেদের মিলিত জ্ঞান, বুদ্ধি ও দক্ষতার মিশ্রণ ঘটালে টিঁকে থাকা বা এগোনো যায়। আবার যখনই নিজেরা এক থাকতে পারিনি তখনই অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তার প্রভাবে পিছিয়ে পড়েছি বা কাজের ক্ষেত্রগুলি শেষ হয়ে গেছে। আমরা বুঝতে পারছি বাইরের মন্দার প্রভাবে আমরা গত বছরের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছি। ফলে সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে, না হলে কাজের নিশ্চয়তা থাকবে না আর কাজের নিশ্চয়তা না থাকলে নূন্যতম প্রয়োজনীয় উপার্জন সময়মত হবে না আর এটা হলে বাইরের অস্থিরতা আমরা সামলাতে পারব না।

সাঁকো, ৩৯/৩ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৪ হইতে প্রকাশিত ও লেজার ম্যাট কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

কবিতা

ঘন্টি	*অমূল্য ভূষণ পাল*	৫
যাবতীয় ভালোবাসাবাসি	*সাইদা সারমিন রুমা*	৫
রাস্তা	*অভিষেক মজুমদার*	৬
বেমানান	*রাত্রি সেনগুপ্ত*	৬
আদেশ ফেরাও, আপেল খাবো	*সোমনাথ মিত্র*	৬
শেষ লাইন	*পারমিতা*	৭
কবিতা	*রঙ্গিত মিত্র*	৭
অশান্ত ঘূর্ণি	*শুভ্রা পাল*	৮
উন্নয়ন	*ইন্দ্রনাথ সিংহ*	৮
ছলাৎ	*সোমনাথ মিত্র*	৮
বালুকা বেলায় একদিন	*অনুপা (রায়) গুড়িয়া*	৯
হে কিষেণজী.....	*সঞ্জয় দাশগুপ্ত*	৯
৪-রকম	*শ্যামল*	১০
কবিতা গুচ্ছ	*পল্লববরন পাল*	১১
পাঁজির পাঁচালি	*অয়ন ঘোষাল*	১২
শুভেচ্ছা	*সিদ্ধার্থ দত্ত*	১৪

শিশু ও কিশোর বিভাগ

একটি অসমাপ্ত ভ্রমণ কাহিনী	*অর্কপ্রিয়া দাশ*	১৫
একটি গ্রামে	*রোদ্দুর*	১৫
পৃথিবী ছাড়িয়ে ক্রেনিয়াসে	*অর্ক দাশগুপ্ত*	১৬
An Appeal To a Dusty Oblivion	***Surya Shekhar Chakraborty***	**18**
The Perfect Lady...	***Surya Shekhar Chakraborty***	**18**
The Night before Final Term	***Surya Shekhar Chakraborty***	**19**
True education—the medicine of life	***Sunny Roychoudhury***	**19**
বন্ধুত্ব	*কৃশানু ভট্টাচার্য্য*	২০
জল	*কৃশানু ভট্টাচার্য্য*	২১

পাখি	*মুদ্রা (শ্রীধন্যা ভট্টাচার্য)*	২১
The Day	***Raddur Samaddar***	**22**
Path	***Raddur Samaddar***	**22**

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক	*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	২৪
এক-চোখো সংস্কার	*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*	২৫
নির্জলা সত্য	*অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য*	২৮
পথ দেখালেন আনন্দ	*রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য*	৩২
অনু গল্প	*পারমিতা*	৩৪
পাহাড়তলি...শহরতলি	*দেবযানী ভট্টাচার্য*	৩৪
মরুভূমির রাজ্যে	*শর্মিষ্ঠা দাস*	৩৫
ছোট্ট মানুষ টিনটিন	*শ্রীমতি কল্যানী দাশগুপ্ত*	৪০
মূল্যবোধ ও আমরা	*অমিত হবিষ্যাসী*	৪১
নিষ্ঠুর মজা	*অজয় মল্লিক*	৪৩
বর্তমান সমাজের সামাজিক অবক্ষয় এবং তার প্রতিকার	*অসিত মজুমদার*	৪৫
পুঁজিবাদের টানে সমাজের বিবর্তন	*জগন্নাথ রায়*	৪৬
চুল নিয়ে চুলোচুলি	*শ্যামল*	৪৯
The Importance of Communication	***Ananya Chakraborty***	**51**
Stay Hungry, Stay Foolish	***Prasun Ray***	**52**
Real Myth	***Aritra Bhattacharya***	**54**
SMILE AS A LYRICAL EVALUATION.....:	***Souravi Chatterjee***	**55**
The Impact of Social & Environmental Crisis on Women in North East India (*With Special Reference to Meghalaya*)	***Dr. (Mrs) Manjari De***	**56**

স্থায়ী বিভাগ

● পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন একটি বিকল্প		
কারিগরী ক্ষেত্রে জীবনভর অবিরাম শিক্ষা কি সম্ভব?	*প্রণব রায়*	৬১
Temper কারখানার চোখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ— *পর্ব-৪, বিষয় - পরিকল্পনা*	***Temper** কারখানার পক্ষে বিপ্লব ভড়*	৬৫
Energy - Present & Future- Few questions	**A collating initiative by TMC group**	**70**

কবিতা

ঘন্টি

অমূল্য ভূষণ পাল

কেউ যেন কড়া নেড়ে গেলো
দরজায় ঘন্টি বাজালো—
বৈষয়িক নানাবিধ তৈজসাদি নিয়ে
আমার তখন হাত জোড়া;
আভাসে জেনেছি মনে তবু
খাঁ খাঁ রোদে জৈষ্ঠ্যের দুপুরে
নির্ঘাৎ অতিথি এসেছিলো।

কোনো চিঠি টেলিফোন ফ্যাক্সবার্তা
পাঠাইনি তাকে
আঁকাবাঁকা পথে তবু জীবনের বন্ধুর বিপাকে
আমার আপন কেউ অনিবার্য থাকে—
সেই এসে অসময়ে ডাকে।

আমাদের পৃথিবীর অলিগলি
দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ঘুরে
প্রাচীন পিওন আসে এপাড়ার পড়ন্ত দুপুরে—
তারই পিছু পিছু
আরো কেউ, আরো যেন কিছু
আসে আর ছুঁয়ে যায় হঠাৎ আমাকে।

জীবনের যাবতীয় বিস্ময়চিহ্ন দিয়ে আঁকা
কোনো এক অন্তর্গত স্বপ্ন-সাগরিকা
সামাজিক মাপে কোনো নেই চেনাজানা
তবু তার সর্বনাশা এই আনাগোনা

সব কিছু ভেঙেচুরে যায়
ঘুর্ণির ঘন্টি বাজায়।

যাবতীয় ভালোবাসাবাসি

সাইদা সারমিন রুমা
(International Director at Canadian Educational Services, Toronto, Ontario)

আসলে পৃথিবীতে যাবতীয়
ভালোবাসাবাসির ঝামেলা না থাকাই ভালো
গভীর রাতে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে
আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসি ঈষ
হঠাৎ হৃদপিন্ডটা মুচরে উঠে
আর মনের গহীনে জেগে উঠে অভিমান
ঘুমের মাঝে ডুবে আছে
এই আধো ডোবা শহরটা
আমি জানালার পাশে এসে দাঁড়াই
ভালোবাসা আর ঈর্ষা-এ দুটো
কখনই পাশাপাশি চলে না
ভালোবাসা বলতে যেখানে থাকবে বিশ্বাস
আর মুক্ত আকাশের মতো মন
অথচ দেখা যায় ভালোবাসার অর্থ
অনর্থেই হারিয়ে যায়
তাই ভালোবাসাবাসির ঝামেলা
না থাকাই ভালোই
যে ভালোবাসায় পুর্নিমার চাঁদটাকে
পেড়ে আনতে চায় হাতের মুঠোয়
সে হাতটাই একদিন হয়ে যায়
বড্ড বেশি অপরিচিত
যে আকাশ বাতাস পাহাড় নদীরা
কথা বলে ভালবাসার সময়ে
ওরাই একদিন হয়ে যায় মৌন
আমি আবার জানালা থেকে ফিরে আসি বিছানায়
আর দৃঢ়ভাবে বুঝে নিই
আসলেই পৃথিবীতে যাবতীয়
ভালোবাসাবাসির ঝামলা না থাকাই ভালো।

রাস্তা

অভিষেক মজুমদার

অধিকারের লড়াই আজ রাস্তাতে,
বেঁচে থাকার লড়াই কোনো দিন
বিক্রি হয় না সস্তাতে,
লড়াই যে আজ রাস্তাতে।
শ্রমিকের শ্রম হচ্ছে চুরি
আজ শিক্ষাকে কিনছে অর্থ,
মূল্যবৃদ্ধি দুনিয়া জুড়ে
সাধারণের বেঁচে থাকা আজ বড় কষ্ট।
তাই প্রতিবাদ আজ রাস্তাতে।
বিদ্রোহ আজ কবিতায়
বিপ্লব গানে গানে,
কত শত মানুষ এক হচ্ছে আজ
মেলাচ্ছে গলা শ্লোগানে।
তাই প্রতিরোধ আজ রাস্তাতে।
পুলিস আজ এসে চালাক গুলি
তাতে কার কি বা এসে যায়,
পুঁজিবাদ কে কবর দিতে
নেমেছি যে আজ রাস্তায়।
তাই প্রতিশোধও আজ রাস্তাতে।

বেমানান

রাত্রি সেনগুপ্ত

কেন দূর থেকে দূরে অনিমেষ চলে যাচ্ছে?
চিঠি, ডাকবাক্সেই অনন্তকাল থাকছে।
ফাঁকা, মাঠ দেখে কেন মেঘ করে এল মনে
কেন, ত্রিভুজ আঁকি খাতার বাঁদিক কোনে?

কোন, সবুজ ঘাসের মাথায় জিরোয় ফড়িং,
কিস্তি, শোধের দিকেই সুলভ গৃহের ঋণ।
আজ শ্যাম্পু মেখেছি, চুল আঁচড়াবো কাল।
আজ, কুমির এনেছি, পরশু কাটবো খাল।

দিব্যি সাবান মেখেই ফর্সা হলাম আমি।
পড়ে, পাওয়া চৌদ্দআনার মতই দামি।
কোন, অলংকারে বাক্য রচনা করব?
আমি, মরণ কালে হরির কোলেই মরব।

কি দারুণ কিছু নিদারুণ ফটোগ্রাফি,
বনের, মোষ তাড়িয়েও সময় থাকে কাফি।
জুন মালিয়াকে যদি 'মাল্য' লেখা হয়,
শোলের কালিয়া তবে 'কাল্য' কেন নয়?

কেন চোখের জলে গাল ভেজালাম, ইশ্!
অঙ্ক মেলেনি, তাই ইঁদুর মারার বিষ!
বেঞ্চে খোদাই করে ভালোবাসার সই,
নিজের কাছেই নিজে সুপারহিরো হই।

আদেশ ফেরাও, আপেল খাবো

সোমনাথ মিত্র

অনন্ত এক ব্যাথা আছে বুকে
অনন্ত এক স্বেচ্ছাচারী মানুষ
আদেশ দিচ্ছে খুল্লতাত কেউ
সঙ্গে ইচ্ছা লেগেই আছে ফেউ।

দুটো পা-ই দুই নৌকায় রাখা
একটা পুবে আর একটা পশ্চিমে
খুল্লতাত, নাকি স্বেচ্ছাচারী
কোন দিকে সেই ভালবাসার নারী।

একটা শুধু ব্যাথাই আছে জেগে
মন কেমনের বিকেল বেলার ছাদে
আদেশ মেনে দিচ্ছি গাছে জল
ফুল ফুটলেও কোথায় আপেল ফল?

আপেল খাবো ছোট্টবেলার সখ
খুল্লতাত তর্জনী বার করে
স্বেচ্ছাচারী মানুষ মুক্তি চায়
তর্জনী নয়, আপেল খেতে চায়।।

শেষ লাইন

পারমিতা

এখনো শেষ লাইন লেখা হয়নি চিঠিটার,
এমনই ছিল মজার ব্যাপার—
বয়স ষোলো কি সতেরো
আবছায়ায় আলোতে মনের কথা
সেই শুরুর দিন,
শ্রীচরণেষু, নানা যা তবে! 'আমার তুমি'
বেশী বেশি বাড়াবাড়ি হবে।
নামটি দিয়েই সম্মোধন,
তারপর কি লিখব—
'কেমন আছ তুমি'?
লিখব তবে 'আমার কথা তোমার মনে...'
না, সে টা আমার না জানাই ভালো।
'আজ যখন চোখের দিকে তাকিয়ে...'
দূর, যদি ও না ভাবে।
লজ্জা হল, সংকোচ ছিল সাথে
কি বলব আবার কি লিখব হাতে।
আশঙ্কা ও ছিল অনেক,
যদি এভাবে না ভাবে।
দেখতে দেখতে দিন গেল, সপ্তাহটা এল
মাসের পরে মাসকে নিয়ে
বছর ঘুরে গেল।
বছর বছর চলে গেলো
এখন তুমি ব্যস্ত,
বৌ আর ছেলেমেয়ে
সংসার একটা আস্ত।

আমি এখন জনকল্যাণে
বয়স্কদের পড়াই,
যে মায়েরা ভাত পায়না
তাদের খাবার জোগাই।
লেখার ছিল অনেক কথা
কোথায় লেখা হল
দেখতে দেখতে সেই চিঠিটার
শেষ লাইনটাও এল।
চিঠিটা তো বদলে গেছে
বদলেছে তার ভাব,
শেষ লাইনটা লিখতে চাইছি
কিন্তু শব্দের বড় অভাব।

কবিতা

রঙ্গিত মিত্র

(১)

এলে বেলে বাসগুলো যারা সকাল বেলা এসেছিলো,
তারাও বাড়ি চলে গেলো
আর আমি আমার পাশে বসা সহকর্মিনীর মোবাইলে 'ওয়ে'
এফ এম দেখছি
বাদামের গন্ধে বিভোর বাসস্টপ;
ওপাশে একটি বাচ্চা মেয়ে, চিপস কেনার আনন্দ উত্তাল
তার মায়ের চোখে, সকালে বাবুদের ইস্কুল...
সিগনাল লাফাচ্ছে জানলায়
ঢেউ থেকে মাথাতুলে আছে বাস...যেভাবে একজন মানুষ
অন্যের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে চলে যায়...

(২)

পুর ও কি ঘরোয়া হয়
আবার আড্ডা মারার রক;
রকের পাশের বাড়ি থেকে তুমি রিক্সায় চলে গেলে,
বাসস্ট্যান্ডপুর
সেই মেয়েলিআদর আসে পাতার উপর
স্বপ্নের আগুন জ্বালা...পুরুষ প্রহর

আমাদের ঘুম নেই...ঘুমের ভান করে নিজেদের বুঝে নিই
নিজেদের সব আবেদন
এখন প্রশ্ন একটাই...প্রেম কি বয়স নির্ভর!!!

(৩)

প্রত্যেকটা সুযোগ হারিয়ে যায়
টিনটিন চলে আসে আমার ডাকবাক্সে
বিদেশ থেকে আসা চিঠির স্ট্যাম্প আমার প্রিয়
প্রিয় সেই সব অক্ষরের প্রেত, আমার স্বপ্ন দেখায়
কিন্তু তোমায় কখনো সেটা বলতে পারিনি
তোমাকে জমিয়ে রেখেছি আমার এম-এম-এসে,
আমার ডাইরির পাতায়

ট্রাম লাইন পেরিয়ে তোমার লেটার বক্সে চিঠি পাঠাবার আগেই দেখি, রনির বাইকে তুমি গোলপার্ক দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছো...

অশান্ত ঘূর্ণি

শুভ্রা পাল

পরিশ্রান্ত দিনের বৈকালিক অবসরে
নীল আকাশকে সঙ্গী করে
কল্পলোকে যখন ভেসে যেতে চায় মন,
ঠিক তখনই — হৃদয় কোনে,
'দুর্ভাবনা' দোল খেতে খেতে -
হুল ফুটিয়ে দেখিয়ে দ্যায়—
রুক্ষ-কঠিন বাস্তবের যন্ত্রণায়
পৃথিবীটা কত বদলে যাচ্ছে প্রতিদিন,
'জাতি-বিদ্বেষ' আজো সমঝোতাহীন।

অমানবিকতার-
অবাঞ্ছিত কীটানু সংখ্যা -
কলুষিত করছে সবুজ মনোরাজ্য,
ভাবনার অস্থিরতায় জন্ম নিচ্ছে অবিশ্বাস।

কে জানে —
আগামী প্রজন্ম
গড়বে কোন নতুন ইতিহাস—
ভাবতেও শিউরে ওঠে মন,
জানি না কখন - কোনরূপে
মৃত্যু এসে দাঁড়াবে শিয়রে.....

উন্নয়ন

ইন্দ্রনাথ সিংহ

(১)
আমার শ্বশুরবাড়ির পাড়ায়,
বাড়ছে আড়ে, বাড়ছে দাড়ায়,
ইমারত এক গগনচুম্বি।
দিনরাত তার হম্বিতম্বি,
পারলে আমাদের সে তাড়ায়
দেখি, ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়।

(২)
ছিল টিবি হাসপাতাল।
দেখে এলাম কাল
ডাক্তার বানানোর
নার্সিং শেখানোর
হয় সেথা কারবার।
একবার ভেবে দেখ হাল।

(৩)
হাওয়া টাওয়া ইদানীং
বেশ যায় বোঝা।
জয় ইঞ্জিনীয়ারিং,
পতিত জমি, সহজ হল খোঁজা।
বেড়ে উঠল, গড়ে উঠল, South City Mall
ইঞ্জিনীয়ারিং-এর জয়-জয়কার
ঘটল কিনা বল।

ছলাৎ

সোমনাথ মিত্র

খরস্রোতা নাই বা হলে তুমি
স্রোতস্বিনী হলেই আমার হবে
একটা শুধু জোয়ার পেলেই রাত
কাটবে হাবুডুবুর মহোৎসবে।

ভাঁটায় যদি ভাসাও, তবে যাবো
সোহাগ মাথা তোমার ছলাৎ বুকে
ভাসবো, নাকি ডুববো অকারনে
তার কোন দায় নেই আজ সম্মুখে।

তোমার ঘোলা জলেই যদি নামি
মাছ ধরতে কিংবা সুখের স্নানে
ভয় পাইনা কোনই ভয়ঙ্করে
পা ধরে সেই কুমির যদি টানে।

কারন তোমার স্রোতের মায়া ছেড়ে
মাটি আমায় টান দেয়নি আজো
আমার বুকে তুমিই স্রোতস্বিনী
রাত্রি দুপুর ছলাৎ ছলাৎ বাজো।।

বালুকা বেলায় একদিন

অনুপা (রায়) গুড়িয়া

(১) স্বর্গদ্বারে

পুরীধামে নির্জনে
দুপুরেতে বসে আছি একেলা—
সাগরজলের শব্দের
ঢেউ গুণে;
উদাস মনে কাল গুণছি।।
প্রকৃতির এই আনন্দেরি খেলা দেখে
মন চলে গিয়েছে - সুদূরে
কোনখানে?
জানি না।।
বিজন অলিন্দে বসে
নিজেকে মনে হচ্ছে
কবি, শিল্পী, আরো কত কি!
জানি
আমি নিতান্ত সাধারণ বালা
তবুও
মানুষের ভাবনায় দোষ কি?

(২) সাগরতীরের কথা

অগণিত মানুষ চলেছে
সমুদ্রের বালুতটে—
মধ্যাহ্নেও সৈকতের
বিশ্রাম নেই আর।
জনস্রোত তাকে মাড়িয়ে চলেছে—
তার দেহবেদনা কে-বা-বোঝে?
সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মাথায়,
মাঝে মাঝে দেখা যায়—
পালতোলা নৌকা
বালকেরা ঢেউয়ের তালে তালে;
জল নিয়ে করছে খেলা।

হে কিষেণজী.....

সঞ্জয় দাশগুপ্ত

ছিলেনা আমার বন্ধু কখনো
মতেও বিশাল ফারাক,
তবুও কখনো চাইনি মনেতে
কমরেড কোনোও
ভ্রষ্টপথেই পথ হারাক।

কমরেড,
তুমি চেয়েছিলে ''চে'' হতে
হয়েছিলে শত্রু সেনানী
এ দেশের শেষ আদমশুমারি
তোমাকে গোনেনি।

হে, কিষেণজী.....
তুমি চাপিয়ে ছিলে
কার্তুজ হাতে নিজের মত,
দানবী বানিয়েছ নিজের হাতে
ভুলে গিয়ে সব সহবত।

কমরেড,
অবশেষে হলে হেনরী তুমি
আর মতগুলো ফ্রাংকেনস্টাইন
ভুলে গেলে কেন?
দেশে জারী আছে—সেই হীরক রাজারই আইন।

হে, কিষেণজী.....
যে দেশে এখনও রামের নামে
ভোট দেয় নর-নারী,
সে দেশে এখনই বিপ্লব খোঁজা
সত্যিই বাড়াবাড়ি।

কিষেণজী
তোমার মৃত্যু খবরে আমি
শান্তি ও দুঃখ পেলাম,
ঘৃণা ভরা বুকে - তবুও জানাই
লক্ষ্যকে সেলাম।

৪-রকম

শ্যামল

ধূসর স্মৃতি

মেঘলা আকাশ
কখনো গুমোট, কখনো এলোমেলো হাওয়া
কখনো ঝিরিঝিরি, কখনো ঝমঝম।
জানলায় বসে
ক্লান্ত নয়নে পথ চেয়ে থাকা
হঠাৎ, তোমায় মনে পড়া-
এলোমেলো চুল
ভিজে যাওয়া শাড়ি।
লাজুক দৃষ্টি
ঠোঁট চাপা হাসি।
জানি না, এখনো
তুমি আমায় ভালবেসে ছিলে কিনা,
বা, আমি তোমায়....

এপিটাফ

শত্রুর গুলিতে বা আক্রমনে, আমার মৃত্যু হয়—
আমার মৃতদেহের উপর রেখো একটা লাল গোলাপ।
যেন সবাই বুঝতে পারে—
আমি লড়াইকে ভালোবেসেছিলাম।
আর, মৃত্যুর পর উপস্থিত সবাইকে দিও
একটা করে সাদা গোলাপ
যেন সবাই বুঝতে পারে—
আমি শান্তি চেয়েছিলাম।

আরেক একটা কথা সবাইকে বলে দিও—
আমি মানুষকে ভালোবেসেছিলাম।

জন্মসার্ধশতবর্ষে

কিছু একটা করতেই হবে। সেটা যদি বিখ্যাত লোকের হয়।
জীবিত হলে এক রকম, আবার মৃত হলে আরেক রকম।
আবার দেখতে হবে, তিনি কে? অর্থাৎ তার কর্মক্ষেত্র। ধুর
কিছু বেলে বকে ফেললাম। বেশ করলাম।

যা বলার বলেই ফেলি।
হ্যাঁ, রবিবাবু তুমি আমার আদর্শ ব্যাক্তি নও।
তবুও আমার চিন্তায় তোমার উপস্থিতি সদা সততই।
তোমার বহু লেখার সঙ্গে আমরা ঘোর বিরোধ।
সেই বিরোধ আমাকে কত জানায়, শেখায়।
তোমার লেখা ভারী অদ্ভুত-
একেকবার একক রকম মানে হয়ে দাঁড়ায়
অন্তত আমার কাছে।
আমার আকাশ দেখা জানলা দিয়ে
কখন সখন ছাদে গিয়ে
আর, রাস্তায় দেখি বৃষ্টি আসবে কিনা—
আমার মানুষ দেখছি অনেক
রাজনীতি আর সমাজসেবার দৌলতে।
এখানেও তোমার প্রভাব বড্ড বেশি।
তোমাকে নিয়ে সমালোচনা সহ্য হয়।
যদি তা সত্যিই সমালোচনা হয়।
কিন্তু তোমার গানের বিকৃতি
আমার সহ্য হয় না।
তারা লিখুক না নিজের মতো করে
যা ইচ্ছে সুর দিক, যত খুশি বাজনা বাজাক।
তোমার জন্মদিনে তুমি থাক নীরবে
আমার হৃদয় জুড়ে।

কিস্তিমাত

আট পঙ্কতি, আট সারি
চৌকো ঘর, চৌষট্টি।
সাদা কালো, পাশাপাশি
বর্গাকার, সমান সকলি।

প্রস্তুত দুই ধারে
ষোল জনের সৈন্যদল।
সাদা কালো দুই পক্ষ
উভপক্ষের সমবল।

দুই ঘোড়া, দুই হাতি
নৌকা আছে দু-খানি,
সামনে আট সেনানী
রাজা-মন্ত্রী মধ্যমণি।

সকল ঘুঁটির আলদা গড়ন
নিয়মে বাঁধা সবার চলন।
নয় মারো, কিংবা মরো
রাজার চাল বন্ধ করো।

রাজা বন্দী ঘুঁটির চালে
করলে তুমি বাজিমাত।
বলবে মুখে উল্টোদিকে
এই যে ভায়া, কিস্তিমাত।

কবিতা গুচ্ছ

পল্লববরন পাল

একটা কবিতা লিখে

একটা কবিতা লিখে বাঙলার শিল্পসমাধান
একটা কবিতা লিখে শেষ হবে সন্ত্রাসের রাত
একটা কবিতা লিখে উথলাবে সোনার ফসল
একটা কবিতা লিখে দিতে হবে চরম আঘাত

একটা কবিতা লিখে চিহ্নিত হবে শত্রুরা
ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন মুখোশ যাবে খুলে
একটা কবিতা লিখে বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক
একটা কবিতা লিখে পৌঁছে যাবো সমাধান-মূলে

প্রশ্ন থেকে উত্তরে বা উত্তর থেকে দক্ষিণে
শব্দ আর অক্ষরেরা গরম তুমুল গোলাগুলি
কবিতার জলোচ্ছাসে ধুয়ে যাবে পাপী মহাদেশ
ভেজা ক্যানভাসে উঠে আসুক নতুন রঙ-তুলি

কবিতা, কোথায় তুমি? এ কালনিদ্রা থেকে জাগো
ইস্পাতছুরির মতো লকলক করুক আশ্বাসে
মহত্ত্বর জীবনের মিছিলে শ্লোগান হয়ে এসো
নইলে বাংলা দ্যাখো ক্রমাগত ভরে যাচ্ছে লাশে

জ্ঞান-ঈশ্বরী

ঘুম নিয়ে গেলো ঘুমহীনতার দেশে
রাজনীতি সন্ত্রাসের সঙ্গে মেশে
উড়ে গেলো ট্রেন ঘুমন্ত শবদেহ
এও রাজনীতি - নেই কোনো সন্দেহ
এস্ টু-র মাথা এস্ ফাইভের ধড়ে
কাটা জানলায় কাটা হাত নড়ে চড়ে
চারদিক জুড়ে জঙ্গল সন্ত্রাসী
মাথায় রাত্রি টিআরপি প্রত্যাশী
বকধর্মের গরম শান্তিজল
ছিটিয়ে বলেন — শত্রুর গ্যাঁড়াকল
চলে যান প্রাক-নির্বাচনিক প্রচারে —
শত্রুর নামে কালি দিয়ে ভোট গোছা রে
শত্রু তখন নীরবে সরডিহায়
তোবড়ানো বগিতে জীবন হাতড়ায়।

নির্বাচন ২০১১

আমার বিছানা জুড়ে শিল্পিত সন্ত্রাস দাও
স্বপ্নশকটভিত্তি ধ্বংস করো দেহচারণায়
বালিশপাহাড় জুড়ে তুলোঝড়ে দাও আশকারা
নখে নখে রক্ত হেঁটে যাক শরীরের সীমাদেশে
ঘৃণ-নয়নে শুয়ে শুয়ে গ্রাস করো উন্নয়ণশিখা
যাপনে বিকৃত করো আমাদের ভাষার আবেগ
এ গভীর মধ্যরাত দহনে আকুল জ্বালামুখি
আমাকে দহন দাও — তুমি বসো রঙ তুলি নিয়ে
শ্বাপদ শৃঙ্গার আঁকো অনিচ্ছুক বিছানা ক্যানভাসে
এই মুহূর্তের নেই লিপিযোগ্য আগামী-অতীত
জ্বালামুখে সত্য হোক আরণ্যক আদিম উৎসব

আপাতত বিনাশেই নিষ্ঠ হও আপাদমস্তক
সঙ্গম-বিক্ষত দেহে ভস্মশয্যাভূমি ফুঁড়ে কবে
মিঠে লাল ভোরের অঙ্কুর ফুটে উঠবে সেই আকাঙ্খায়
অন্ধকার ঘাড়ে করে রাতভাঙা কাজে নামতে হবে

বাসনাবৃষ্টি

আজকে তোমায় বলবো আস্ত পৃথিবী
শুনতে চাও কি না চাও — নিছক অবান্তর
পৃথিবীর গান আকাশ কি মনে রাখবে না?
সেটা আকাশ আর পৃথিবীর ভালোবাসান্তর

তার চে' তোমায় একটা আকাশ শোনাচ্ছি
যেদিন সে ছুঁড়ে মারলো ধারালো বৃষ্টিও
তারিখ বা সন সঠিক স্মরণে নেই আমার
যতোদূর মনে হয় একাদশ খৃষ্টীয়

তোমাকে বলতে পারতাম যদি এইসময়
অবসাদে বুক চুরমার মুখ থমথমে
পৃথিবী-আকাশে বৃষ্টিরা কেন নিরুদ্দেশ
পাতাল সফরে টালিগঞ্জ থেকে দমদমে

জানি তুমি এর একটা কথাও শুনবেনা
বাতাসের মতো ভেসে চলে যাবে দূর গ্রামে
আকাশ পৃথিবী যেখানে গোপন শৃঙ্গারে
মিলিত হবার বাসনাবৃষ্টি নীল খামে।

পাঁজির পাঁচালি

অয়ন ঘোষাল

পাঁজির আদিকথা

শুন শুন সর্বজন শুন দিয়া মন।
পাঁজির কাহিনী কথা কবির বর্ণন।।
আদিম মানুষেরা কাঁচা মাংস খেত।
তারি সাথে ফলমূল যাহা কিছু পেত।।
চাষ বাস আদি কর্ম জানিত না ভাই।
সময়ের ধারণাটা ছিলো নাকো তাই।।
হাজার বারো বছর আগে হালচাল দেখে।
বীজ বোনা আদি কার্য মহিলারা শেখে।।
জমি চাষ করে বাঘ সভ্যতার ঊষা।
চাষের কাজেতে চাই সময়ের ভাষা।।
সূর্য দেখে দিন রাত মানুষ শিখিল।
পক্ষকালে চাঁদ জাগে সেটা নিরখিল।।
বৃষ্টির বারিধারা ফিরে ফিরে আসে।
তাই দেখে বছরগোনা হয় বারো মাসে।।

পাঁজির জন্ম কথা

সূর্যের চলাফেরা আকাশের বাটে।
সারা বছরের চলা তারাদের পটে।।
আকাশের পট জুড়ে অগনিত ছবি।
সূর্যের পথ জুড়ে বারোটিকে ভাবি।।
বারোটিতে বারো ছবি নাম তার রাশি।
বারো ভাগে তিনশো ষাট কোন ভাগ কষি।।
প্রতি ছবি ভাগে ত্রিশ ডিগ্রি করে পায়।
এক মাসে সূর্য তাই ত্রিশ ডিগ্রি যায়।।
সূর্যটারি চলার পথ রবিমার্গ নাম।
সেই পথ ব্যেপে আছে বারোটি রাশির ধাম।।
রবি মার্গের দুই পাশে নয় ডিগ্রি করে।
গ্রহগুলির চলাফরা সেই পথ ধরে।।
মেঘ, বৃষ, মিথুন কর্কট প্রথম চার রাশি।
সিংহ, কণ্যা, তুলা নাম আছে পাশাপাশি।।
বৃশ্চিক, ধণু, মকর, কুম্ভ আরো চার।
মীন নামেতে শেষ রাশি রাশিচক্র পার।।
প্রতি রাশির মধ্যে আছে যে মূল তারা।
নক্ষত্র বলি তার নামেতে মাস ধরা।।
বিশাখা নক্ষত্রের নামে বৈশাখ মাস হয়।
জ্যেষ্ঠার নামেতে জ্যৈষ্ঠ মাসকে চেনা যায়।।
এমনি করে চিত্রার নামে চৈত্র মাস হয়।
বারোটি তারার নামে বছর ঘুরে যায়।।
তবুও সূক্ষ্মতর গণনা করি।
বছর জুড়ে সাতাশটি নক্ষত্র ধরি।।
সূর্য চাঁদের অবস্থানের ফারাক দেখে।
তিথি নামে সময়েরি একক শেখে।।
গ্রহদের নামে নামে সপ্তাহ ভানি।
যোগ ও করণ কালের সূক্ষ্ম একক মানি।।
বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ লেখা হয়।
পক্ষ অঙ্গ আছে বলে পঞ্চাঙ্গ কয়।।
বাংলাদেশে তার সঙ্গে বারব্রত জোড়ে।
পঞ্জিকা নাম তারি, পাঁজি মুখে ঘোরে।।
ভারতের মানুষজনের সর্বদর্শন সার।
পাঁজি বিনে অন্ধকার আজ দেখে সংসার।।

পাঁজির ভাগ্য বিড়ম্বনা

কাল মাপার সূক্ষ্মতম সারণী পাঁজি।
ভাগ্যের বিড়ম্বনায় পড়েছে সে আজি।।
বরাহ লিখেছিলেন সূর্য সিদ্ধান্ত।
সেই থেকে পাঁজির আর দুর্গতির নেই অন্ত।।
আকাশ চিনে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হাতে।
পাঁজির জন্ম সেদিন হয়েছিল রাতে।।
আকাশের গ্রহতারা নিজেদের মতো।
প্রকৃতির নিয়ম মেনে যাতায়াত যতো।।
বরাহের সিদ্ধান্তে কখনো তা নয়।
মানুষের ভাগ্য সেথায় নিয়ন্ত্রিত হয়।।
রাহু-কেতু-রবি-শনি কে কোথায় রবে।
তাই দেখে মানুষের ভাগ্য বলা যাবে।।
কেমন করে জানবো আজ সত্যি সেটা হয়।
বরাহ যে বলেছেন মিথ্যে সেটা নয়।।
সতি কি না যাচাই আজ করতে যদি চাও।
জে বি নারলিকারের মানমন্দিরে যাও।।
একশো জন বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়ে।
হাজার জন পড়ুয়ার ভাগ্যটা গুনিয়ে।।
পরিসংখ্যান কষে আজব ফল মিলিলো।

হেড্ টেল্ টস করিলেও একই তথ্য এলো।
জ্যোতিষীরা গণনায় কত টাকা নেয়।
একটি মাত্র পয়সা থাকলে টস করা যায়।।
তবুও মানুষজন ভাগ্য গুণতে ছোটে।
বিপদের ভয়ে তারা শনির পায়ে লোটে।।

গ্রহ বিভ্রাট

আকাশের গ্রহতারা অদৃষ্ট চালায়।
গ্রহদের হিসেব চাইলে জ্যোতিষী পালায়।।
নবগ্রহ আছে সেটা সবাই জানি।
তালিকাটা জানতে চাইলে বিপদ মানি।।
রবি ও সোম গ্রহ হয় পাঁজির হিসাবে।
নক্ষত্র ও উপগ্রহ গ্রহ কী ভাবে?
রাহু কেতু গ্রহ নাকি? সত্যিই আছে?
গ্রহণ গোনার সুবিধায় কল্পনাতে আছে।।
আর পাঁচটি গ্রহ সূর্য প্রদক্ষিণ করে।
পৃথিবী গ্রহ বলে জ্যোতিষ না ধরে।।
এমন যদি গণনার ভিত্তিভূমি হয়।
কেমন করে গণনাতে ফলের মিল রয়।।
বুদ্ধি করে আন্দাজ করতে যদি পারো।
জ্যোতিষমশাই হয়ে আন্দাজে ঢিল মারো।।

দৃকসিদ্ধি

পাঁজির কথা বলছো আজ বলতো দেখি।
তোমার হাতের পাঁজিটা আসল না মেকি।।
পাঁজির মতে তারারা কোথায় কে আছে।
আকাশ মিলিয়ে দেখো গুলিয়ে গেছে।।
আহ্নিক বার্ষিক ছাড়া আরো গতি আছে।
অয়ন চলন নাম তার ভুলনাকো পাছে।।
আজকে যাকে ধ্রুব তারা বলছো ভাই।
হাজার বছর আগে দেখো ধ্রুব সে নাই।।
পৃথিবীর অক্ষটা লাট্টুর মতো ঘোরে।
হাজার বছর আগের আকাশ যায় তাই ঘরে।।
আগের আকাশ দেখে যে পাঁজি বানানো।
আজকের আকাশেতে যাবে না মেলানো।।
আঠারোশো নব্বই সালে নতুন করে।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত রচনারি পরে।।
অয়ন চলনের কথা হিসেবে আনি।
নতুন মতের পাঁজি আজ দৃক্‌সিদ্ধ জানি।।
ভাগ্যের যাঁতা কলটা মুক্ত করে দিয়ে।
মেঘনাদ সাহা আসিল নতুন পাঁজি নিয়ে।।
সরকারী প্রকাশ আজ রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ।
মেঘনাদের স্বপ্নটি আজ হয়েছ ভঙ্গ।।
জ্যোতির্বিজ্ঞান পাশে ঠেলে জ্যোতিষ রাজ।
রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গটা জুড়ে আছে আজ।

ভাগ্যহীণদের কথা

বারো মাসে বারো ছবি নাম তার রাশি।
মোটামুটি সমান অংশে আছে ভাসি।।
কিন্তু যদি ঠিক মতো বিচার করতে চাও।
সর্পধারী রাশির কথা হিসেবে নাও।।
বারো রাশির এলাকা বাদ রেখে ভাই।
ত্রয়োদশ রাশিটিতেও সূর্যটিকে পাই।।
সেই রাশির সময় তোমার জন্ম যদি হয়।
তোমার ভাগ্যেরই বিচার জ্যোতিষশাস্ত্রে নয়।।

শেষ কথা

এতবধি অবিচার পাঁজিতে আছে।
তবু পাঁজিকে বাদ দেবার জো কি আছে।।
পাঁজিকে বাদ দিলে দেশ বুঝবে নাকো ভাই।
পাঁজিকে বাদ না দিলে মুক্তি তোমার নাই।।
পথ যদি পেতে চাও চিনের কথা ভাবো।
মেঘনাদের স্বপ্ন নিয়ে খাঁটি পাঁজি পাবো।।
সেই আশা নিয়ে করি পাঁচালি সারা।
অয়ন ঘোষের কথা শোনে গুণী তারা।।

কৈফিয়তঃ পাঁচালির ছন্দের চোদ্দোমাত্রা সাধ্যমতো বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ত্রিপদী ছন্দ ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। পাঁচালিতে একদাঁড়ি ও দু দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো যতি চিহ্ন থাকে না। কিন্তু কয়েক জায়গায় আধুনিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি। পাঠক মন খুলে সমালোচনা করলে সম্মৃদ্ধ হবো।

শুভেচ্ছা

সিদ্ধার্থ দত্ত

ব্যথা মেয়ের সারা শরীর জুড়ে
মাথা থেকে নামে ঘাড়ের 'পরে
শ্বাসের টানে রাত জাগা দু চোখে
ভোর হয় তার রাতকে কোলে ক'রে।

সকাল হতেই কত রকম কাজ
কত হুকুম, কতই না ফরমাশ
যথানির্দেশ পালন করে মেয়ে
বিশ্রাম আর হয় না ছুটি চেয়ে।

ব্যস্ততা তো নিত্যদিনের
রোজ, সম্বৎসর সারাটা দিনভর
অসুস্থতার থোড়াই করে কেয়ার
কাহিল হলেও নেই যে বিরাম তার!

এসব কিছুর সাক্ষী থাকে গাছ
ফুল, পাতা আর তার বাগানের ঘাস
সাক্ষী থাকে আধো তন্দ্রায় রাত
ঊষার আলো, দিনের সংলাপ।

গাছ বলল : ভালো থাকিস তুই
ফুল বলল : আমার দিকে চা
পাতা বলল : আয়না তোকে ছুঁই
ঘাস বলল : আমায় নিয়ে যা;
রাত বলল : কিছুই বলছি না
ভোর বলল : আমার আলোয় ধুই।

আলোর স্নানে সতেজ হয়ে ওঠো
বোধ যেন পায় রাতের গভীরতা
ফুলকে তুমি দুচোখ ভরে দেখো
স্পর্শে থাকুক ঘাসের পেলবতা।

ফুলের রেণু ছড়িয়ে চর্তুদিকে
বাজল যখন কোমল রেখার রাগ
আমি তখন কথার মালা গেঁথে
শুভেচ্ছাতে মিশিয়ে দিলাম সোহাগ।

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০

শুভ সূচনা

শিশু ও কিশোর বিভাগ

একটি অসমাপ্ত ভ্রমণ কাহিনী

অর্কপ্রিয়া দাশ

বিগত চারমাস অনেক আলোচনার পরে ঠিক হলো যে পুজোর সময় আমি, বাবাইমনি দাদু ও দিদা South India বেড়াতে যাব। রোজই কিছু না কিছু আলোচনা হতো, শুনতাম আর ভাবতাম কবে যাবার দিনটা আসবে। আরো অনেকে গিয়েছিল। মাস খানেক আগে থেকে দিদা সব গোছাতে শুরু করলো।

অবশেষে আমরা সবাই 28th Sep. করমণ্ডল এক্সপ্রেসে যাত্রা শুরু করলাম। ট্রেন ছাড়লো দুপুর বেলা। জানলার ধারে বসে কত কী দেখতে দেখতে চললাম। বিকালে দিদার সঙ্গে থাকা খাবার ছিল। রাতের খাবারও সঙ্গে ছিল। আমরা seat ছিল middle berth-এ, রাতে খাবার পর যে যার তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম, ট্রেনটি খুব জোরে যাচ্ছিল। কখন সকাল হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। সকালের খাওয়ায় আমরা ট্রেন-এর meal নিলাম। তারপর দুপুরে একটু শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যেবেলা ছয়টার সময় আমরা Chennai পৌঁছলাম। দিদার হাত ধরে আমি ছিলাম। সাতটার মধ্যে আমরা Hotel-এ পৌঁছলাম। ভালো করে স্নান করে আমরা একটি বাঙালি Hotel-এ সবাই dinner করলাম। আমাদের Hotel-টা ছিল Cheepak Stadium-এর কাছে।

3rd October সকালে স্নান করে সব জিনিষপত্র নিয়ে আমরা Pondicherry গেলাম। ওখানে আমরা ২ দিন ছিলাম। ওখানকার Guest House-টা খুব সুন্দর ছিল। Pondicherry আশ্রমে আমরা সবাই গেলাম। ওখানে ঋষি অরবিন্দ ও শ্রীমার সমাধি দেখলাম, ওখানে কথা বলা বারণ, ওখানে আমরা কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর কিছু বই কিনে আমরা Guest House-এ ফিরে গেলাম। ওখানে সময় মতো খাওয়া দাওয়া করতে হয়। আমরা Auroville, গণেশ মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখলাম। তারপর সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ বেড়ালাম।

এরপর 5th Oct. পন্ডিচেরী থেকে আমরা Chennai এলাম এবং ওখান থেকে Kanyakumari-র Train ধরলাম। বিকাল 5.30 টায় ট্রেন ছাড়লো। ওখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-এ দুদিন ছিলাম। Vivekananda Rock আমরা Steamer-এ করে সমুদ্রের ওপর দিয়ে গেলাম ও কন্যাকুমারী মন্দির দেখলাম। Vivekananda Museum দেখলাম। ওখান থেকে Auto তে করে শুচিন্দ্রম মন্দির দেখলাম। মন্দিরটা খুব সুন্দর।

6th Oct. অনেক রাত্রে আমরা আবার ট্রেন ধরলাম রামেশ্বরম যাবার জন্য। ভোর রাতে দাদু ডাকলো যখন ট্রেনটা সমুদ্রের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল বেশ অনেকটা সময় ধরে। *(ক্রমশঃ)*

একটি গ্রামে

রোদ্দুর

ওটা ছিল পাহাড়ের ধাপ। একটা একটা করে পা ফেলে আমরা যাচ্ছিলাম। একটা একটা করে পা। একটু হড়কে গেলে একদম সড়সড় ঝড়ঝড় করে পড়ে যাওয়া। এরকমই রাস্তা দিয়ে পাকদন্ডী দিয়ে দিয়ে আমরা চললাম ক'জন। রাস্তা আছে, গাড়ি যাচ্ছে, অল্প কিছু লোকজনও। ৬০এর বেশি কয়েকটা পরিবার দিয়ে গ্রাম। গ্রামের মধ্যে পাহাড়ের ধাপে ধাপে তিন-চারটে হোটেল আর কয়েকটি পরিবারের ঘর। সেখানে সকালে মেঘ না থাকলে পাখি আছে নানানরকম। ওরা পাহাড়ি বলে ওদের সব কিছুই কেমন যেন পরিশ্রমীর। ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা পাহাড়ি পথে কয়েক মাইল গিয়ে তবে স্কুলে যায়। খাবারের কোন দোকান নেই—সব কিনে আনতে হয় নিচে থেকে। এমনি একটা জায়গায় বড় এলাচ গাছ থেকে ঘাসের ফুল সবই তো রয়েছে। আমার সঙ্গে ওদের ওই গ্রামটার পরিচয় হল মাত্র দু-দিনের, তারপর ফিরে আসা, তবুও তো যেন একটু অন্যরকম - সব আলাদা। কেমন যেন আমরাও মানুষ আর ওরাও। ওরাও কাজ করে আর আমরাও। জায়গাটার নাম কোলাখাম। এখানের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো ভীষণ মিষ্টি। যেন পাহাড় ঘেরা গ্রামটার মতই। মহিলাদের বেশির ভাগ-ই কাজে ব্যাস্ত। বাড়িগুলোও পাহাড়ি ধাঁচে। জলের একটু সমস্যা, তাই শীত হোক যতই, জলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে ওরা। ওদের কাছে বিনোদন বলতে শুধু গান শোনা—আর এখন Dish Network. তবুও কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল ওরা বেশ সুখী। ওদের দুঃখ অনেক কম, কারণ - ওরা অল্প পেতেই জানে। রিশপ ছাড়িয়ে কোলাখাম। তোমরা সবাই গিয়ে দেখো এসো ছোট্ট পাহাড়ের গ্রামটাকে। একটা ঝরনা রয়েছে - ছাঙ্গু ফলস্। একটু কষ্ট করে সুন্দরী ঝরনার কাছে যেতে হয়। কিন্তু তার জলধারা দেখলে সীমাহীন আনন্দ। কোলাখামকে দুদিনেই কিন্তু বেশ কাছের মনে হয়। খুব নিজের। তাই ওর কথা তোমাদের একটু জানালাম।

পৃথিবী ছাড়িয়ে ক্রেনিয়াসে

অর্ক দাশগুপ্ত

অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে গিয়েছিল সুযোগটা। আজকে ৩০১৫ সালে দাঁড়িয়েও রীতিমতো খরচ না করলে, হঠাৎ এমন সুযোগ আশা করা যায় না। ব্যাপারটা আর কিছুই না, এখন যেসব মহাকাশ ভ্রমণ সংস্থা আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'অ্যাডভেঞ্চার'। তারাই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশে দেশে প্রচার করেছিল যে তারা অ্যাটমিক মাইন্ডেটারের একটি সায়েন্স নেটওয়ার্কিং সাইটে যে জটিল অঙ্কটি দিয়েছে তার সমাধান যে বা যারা প্রথম করতে পারবে তারাই মহাকাশের একটি গ্রহে যাবার সুযোগ পাবে, একেবারে বিনামূল্যে। সেই অভিযান হবে পৃথিবী থেকে ৬৩০ আলোকবর্ষ দূরের কেপলার নক্ষত্রের চারপাশে পরিক্রমণরত গ্রহ ক্রেনিয়াসে, পৃথিবীর বাইরে যেখানে প্রথম ''প্রাণ'' আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেকের সঙ্গে ভারতের বেঙ্গালুরু অ্যাস্ট্রো-রিসার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী বিমল ঘোষ ও চিনের বেজিং সায়েন্স রিসার্চ ল্যাবের বিজ্ঞানী কাও চেন তাদের অ্যাটমিক মাইন্ডেটারের মাধ্যমে এই অঙ্কের সমাধান পাঠিয়েছিল। অগস্ট মাসে আমেরিকার সিলডাভিয়া শহরে 'অ্যাডভেঞ্চারের' ঘোষণা অনুষ্ঠানে তাদের দুজনকেই বেছে নেওয়া হয় মহাকাশের অভিযাত্রী হিসেবে। তাদের দুজনেই একসঙ্গে প্রথম সঠিক উত্তর পাঠিয়েছিল বলে ঘোষণাও করা হয়। আমেরিকায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রস্তুত করা হতে থাকে। এই অভিযানে তারা ছাড়া রকেটে থাকবেন অভিজ্ঞ অ্যাস্ট্রোনমার ইউরি কাসপারভ। তিনি রকেটের সমস্ত বিষয় পরিচালনা করবেন। ২৪শে ডিসেম্বর ৩০১৫ তারিখে তারা তিনজন উঠলেন রকেট 'ডিসকভারি ১০১'-এ। রোবট পরিচালিত অত্যাধুনিক মহাকাশ যান রকেটটি জাপানের আইনস্টাইন মহাকাশ বন্দর থেকে রাত ৮টা ৩০ মিনিট ১২ ন্যানো সেকেন্ডে নক্ষত্রবেগে রকেট এর সাহায্যে উড়ে চলল ক্রেনিয়াসের পথে। যাত্রাপথে কাসপারভ, বিমল ও কাও নিজেদের মধ্যে ক্রেনিয়াস গ্রহ ও রকেটের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলেন। রাত্রে কাসপারভ তাদের জন্য টেবিলের একপাশে রাখা ফুড প্রিজারভেশন বক্স থেকে তিনটি ফুডপসুল বা ক্ষুধা, তৃষ্ণানাশক ক্যাপসুল নিয়ে এসে খেলেন। খাবার পর কাসপারভ তাদের বললেন রকেটের স্লিপিং রুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে। বিশ্রাম নেওয়ার বিশেষ ইচ্ছা না থাকলেও শুয়ে শুয়ে পাশের প্যানেল দিয়ে মহাকাশে বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে কখন যে তারা ঘুমিয়ে পড়েছে তা তারা নিজেরাই জানে না। ঘুম ভাঙল তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দে। কাসপারভ বললেন যে তারা ক্রেনিয়াস পৃষ্ঠ থেকে আর মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে আছেন এবং বিগত দশ ঘণ্টায় পৃথিবী থেকে ক্রেনিয়াসের বায়ুমন্ডলে ঢুকে পড়েছেন। আর মাত্র ৪০ সেকেন্ডের মধ্যে তারা ক্রেনিয়াসে পদার্পন করবেন। অমনিস্কোপ অর্থাৎ চশমার আকৃতির দূরবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে ক্রেনিয়াসকে দেখে কাও ও বিমলের আশ্চর্য রকম সুন্দর বলে মনে হলো। মাঝে মাঝে কিছু কমলা রেখা ছাড়া প্রায় পুরোটাই কেবল সবুজ ঘন অরণ্য, তারা যেদিকে নামছে সেখানে কয়েকশো মিটার এলাকা মরুভূমির মতো বালুকাময়। অসামান্য দক্ষতায় ধীরে ধীরে রকেটের বেগ কমিয়ে রকেটেটিকে সেই মরুভূমির উপর অবতরণ করালেন, একটু মৃদু ঝাঁকুনি ছাড়া আর কিছুই অনুভূত হলো না। তারা সবাই নির্দিষ্ট স্পেসস্যুট পরে নিলেন ও অক্সিজেনের জন্য অক্সিম্যাক্স ক্যাপসুল খেয়ে নিলেন। কারণ, ক্রেনিয়াসে প্রাণ ও বায়ুমন্ডল থাকলেও তাতে থাকা অক্সিজেন মানুষের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এরপর তিনজন তাদের ইলেকট্রনিক ফ্লাইং উইংএর সাহায্যে রকেট থেকে একে একে নামলেন ক্রেনিয়াস পৃষ্ঠে। নেমেই তারা বুঝতে পারলেন যে কমলা রেখার মতো অংশ তারা দেখেছিলেন তা আসলে নদী। যাতে প্রবাহিত জলের রঙ কমলা। এবং দূর থেকে যাকে জঙ্গল বলে মনে করেছিল তা জঙ্গল বটে কিন্তু একটি গাছও তাদের দুজনের পরিচিত নয়। আর এমন ঘন জঙ্গল পৃথিবীর আর কোথায়ই এখন আর দেখা যায় না। এরকম ঘন জঙ্গল একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগেই দেখা যেত। জল দেখে খাবে কী খাবে না কাসপারভকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন এই জল সম্পূর্ণ পানযোগ্য, সাহস করে খানিকটা খেয়ে তাদের দুজন দেখল সেই জল অমৃতের মতোই সুস্বাদু। এরপর কাসপারভ তাদের দুজনের

শরীরে একটি মাইক্রোচিপ আটকে দিলেন ও একটি ঘড়ির মতো যন্ত্র দিয়ে বললেন যে সেটি একটি ইলেকট্রনিক ম্যাপ যা দিয়ে তিনজনের অবস্থান ও রকেটের দূরত্ব জানা যাবে। এরপর তারা ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। মোহিত হয়ে জঙ্গল দেখতে দেখতে কখন যে বিমল অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তা সে বুঝতেই পারেনি। একটা উজ্জ্বল আলোকযুক্ত গাছের নাম কাসপরাভকে জিজ্ঞাসা করতে যেতেই সে বুঝতে পারল সে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু ভয়ের কারণ কিছুই নেই কারণ তার কাছে আছে ইলেকট্রনিক ম্যাপ যার সাহায্যে সে সহজেই বাকিদের খুঁজে ফেলতে পারে। কিন্তু একটু ঘুরে রকেটে ফিরলেই বা দোষ কোথায়? আপনমনে তাই সে জঙ্গল দেখতে লাগল। চলতে চলতে হঠাৎ যেন সে শুনতে পেল একটি চাপা গর্জনের শব্দ। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একটি অজগর, দাঁতসর্বস্ব, নখসর্বস্ব ও সারা দেহে মাছের মতো আঁশযুক্ত প্রায় চারফুট লম্বা জীব তার দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে মুখ দিয়ে করছে 'তিড়িং তিড়িং' বলে এক অদ্ভুত শব্দ। সেটি চাপা আর্তনাদ করতেই বিমল একবার ইলেকট্রনিক ম্যাপে দেখল কাও ও কাসপারভ রকেটের কাছেই আছে। তারপর তীরবেগে রকেটের দিকে ছুটতে আরম্ভ করল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে ছোটাও সহজ নয়, বিশেষ করে ভারী স্পেসস্যুট পরে। মাঝে মাধ্যেই শরীরের বিভিন্ন স্থান আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকল। একবার একটা অজ্ঞাত গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রায় হাড়গোড় ভেঙে যাবার দশা। তাও সে প্রাণপনে রকেটের দিকে ছুটতে থাকল। একবার পিছনে ফিরে দেখল প্রাণীটাও ভাল ছুটতে পারছে না, মাঝেমধ্যেই হোঁচট খাচ্ছে, দূর থেকেই ডিসকভারির মাথা দেখতে পেয়ে সে বারবার তার রেডিওতে কাও ও কাসপারভকে নাম ধরে চিৎকার করতে থাকলো কিন্তু রেডিও এত ধাক্কায় বিকল হয়ে যাওয়ায় কেউ তার ডাক শুনতে পেল না। কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই কাও ও কাসপারভ তাকে দৌড়তে দেখে রকেট থেকে উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে এলেন। বিমলের পিছনের বিকট জীবটাকে দেখেই কাসপারভ তার স্পেসস্যুটের পকেট থেকে বার করলেন তার পারমাণবিক শক্তিযুক্ত পিস্তলটিকে। এই পিস্তল যেকোন প্রাণীর দিকে তাক করে মারলেই কয়েক সেকেন্ডে সেই প্রাণী বেশ কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। কাসপারভ অত্যন্ত সন্তর্পণে পিস্তলটিকে প্রাণীটির দিকে তাক করে ছুঁড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটি বিকট আওয়াজ করে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। এতক্ষণ দৌড়বার ফলে পরিশ্রান্ত বিমল মাটিতে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকল। কাসপারভ তাকে একটা এনার্জি ট্যাবলেট খাওয়ানোর খানিকক্ষণ পর সে ধাতস্থ হল ও তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকল। হঠাৎ এক গগনভেদী বিশাল সমবেত গর্জনে সচকিত হয়ে তারা মহাতংকে দেখল সেই জন্তুগুলি কাতারে কাতারে জঙ্গল থেকে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাসপারভ তা দেখেই বললেন, 'ছুটুন' এবং তিনজনেই প্রায় একসাথে তাদের ফ্লাইং উইং নিয়ে তাতে চড়ে রকেটে পৌঁছে গেল। তখন প্রাণীগুলি রকেটের প্রায় ২৫ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। কাসপারভ দৌড়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকে রকেট স্টার্ট করে দিলেন। ততক্ষনে রকেটের বাইরে আঁচড় ও কামড়ের ধাতব শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং তাদের সেই তিড়িং তিড়িং শব্দে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। তিন...দুই...এক, রকেট বিশাল ঝাঁকানির সাথে নক্ষত্রবেগে ক্রেনিয়াস থেকে ছিটকে বেরোল। মহাবিস্ময়ে ও স্বস্তির সাথে তারা তিনজন অমনিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখল যে জীবগুলো তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই যেখানে একটু আগেও তারা ছিলেন। ধীরে ধীরে ক্রেনিয়াস এক অত্যুজ্জ্বল গোলকে পরিণত হল। উত্তেজনায় এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলেনি। বিমল প্রথম জিজ্ঞাসা করল, 'জন্তুগুলোর নাম কি?' কাসপারভ বললেন, 'লেবিওমাস, প্রথম জন্তুটা আপনাকে তাদের এলাকায় অনাহুত ভেবে তাড়া করেছিল। তার অজ্ঞান হয়ে যাবার সময় তার মুখের চিৎকার শুনে ওর সঙ্গীসাথীরা আমাদের তাড়া করে।' এতক্ষণে কাও অমনিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'এই অভিযান আমার চিরকাল মনে থাকবে, চেষ্টা করব আবার এখানে আসার।' তাই শুনে বিমল বলল, 'পাগল নাকি? আজকের এই অভিযানে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় জায়গা হিসাবে পৃথিবীই ভাল।'

An Appeal To a Dusty Oblivion

Surya Shekhar Chakraborty

He kept walking and walking and walking.

His shoes had worn out, and his coat was drenched. His sore legs spoke endlessly of the endless miles he had toiled and his eyes spoke relentlessly of the relentless path he had before him. He had only travelled half the path. His head was burdened with the thought of his wife, his children and a little diary left unnoticed in a dark corridor, somewhere he could not recall. Dust, dust, dust.

There was dust everywhere. There was dust on his shirt, there was dust settled peacefully on his parched tongue, there was dust in the beads of sweat on his forehead and there was dust in the open stitches of his blackened shoe. There was also dust on the chair he used to sit in, the books he used to page through, the beloved bookshelf and those records of Cliff Richard. There was probably dust there, too, in the corners of the grand staircase in his old school.

He loved the dust. They were everywhere. They could travel anywhere they pleased and not get noticed. Nobody cursed their fate, it was blatantly neglected. Nobody worried about them, a casual swipe of an uncaring, coarse hand was sufficient, wasn't it?

And he tried to run. Despite the heavy clothes on him, he could. The sun was glaring at him, threatening menacingly to stop and proceed no further. The shadows in the boughs seemed to reach out their hands for him, but he did not succumb to the sun. He did not let the cool prevail. He did not let the sweat prevail. He did not allow the sting of the hot air.

He succumbed to the dust and could be seen no more as dust engulfed him in the regular swirls of life and its troubles. He was lost in the abyssal fathoms of time and dust...

There was dust everywhere...

The Perfect Lady...

Surya Shekhar Chakraborty

Miss T was the perfect lady. No one was like her. She did not drink and drive, forget about it- she did not even drink. She never even thought of smoking. Whenever she entered a room, cigarettes were promptly put off. She was loved by all. Everyone loved her. She loved her parents. She adored them. She did go out for drives, but was always escorted by men. But neither did she mind, nor did she pay any attention to them. Although she did belong to a rich family, she paid no attention to her clothes. She was more beautiful than a butterfly perched upon the most luscious rose, or a green oasis in a stretch of endless desert. Her lips were lusciously delicious, exaggerated by her perfect blue eyes. She never cared to wear any makeup. In fact, her beauty would have been marred by makeup. She did not study, she could not read or write and nobody expected nor advised her to do so. Her speech, however, was as beautiful as her looks, and as attractively charming as her personality. Whenever she spoke, mesmerised people hung on to every word, visibly enchanted. They would always beg for more, and she would seldom disappoint. And she was loved for this. And she adored the attention. She did not walk gracefully, but people just liked to see her walk. People just could not get more of her. Invitations poured in every day. She could not reject anyone. She was but fourteen months old...

The Night before Final Term

Surya Shekhar Chakraborty

I ran as fast as my legs could carry me. The dark sky darkened. A troglodyte was running after me. Its footsteps shook the uneven terrain. Falling behind, it threw a glowing globe which came crashing just in front of me and revealed a topographic map. I jumped on to it. The scene changed.

I now found some men chasing me, spears in their sinewy hands and armors just as deadly. They were the Spartans! I found a dark cave ahead and blindly dived into it. I got up bruised. Now there was a man ahead! What are those things? He holds up some pipettes and burettes in his seven hands. In the darkness I groped desperately for support. The man did something, there was a bright green flash and a nauseating smell that dazzled and brought tears to my eyes. And then there was light! A handsome man approached me, a properly dressed man at last. In his hand was the Sterling Engine I made for the school science fair last year. With a smile on his bright face, he asked me how Heisenberg's Principle of Uncertainty could be applied in the quantum universe (?). I was exasperated. The man saw through me and brought out a large, a very large book and looked back at me. It was the Constitution of India. I sank to the ground. He was asking me something but I just could not get it. The ground that supported me was dry, as was my throat. My parched throat was begging for water and my eyes made an attempt to quench it, but the water never found its way. My heart was not beating, it was vibrating. No hyperbole there.

But hey, what's this happening? The man before me was fading away. No it is not my eyes faltering. They were feeling rather good. My throat was suddenly feeling very pleasant. My heart came back to normal. Is this the feeling one gets when he dies? No I am not dying. I am feeling rather good with everything about me looking perfect. A flute was playing somewhere. It was beautiful. No I made a mistake. Someone reads Keats somewhere. Peace finally descended...

The incessant ring of the alarm bell woke me up. A realization came across me- Today was examination day.

True education—the medicine of life

Sunny Roychoudhury

"Education is the panacea of social evils."

Swamiji's aforesaid message is very relevant in this age of social rivalries. Education can remove these problems. But the parents are creating illogical pressure on their children by expecting sky high careers from them. In West Bengal, middle class mentalities of 'making doctors and engineers' make the children think of nothing else. Creating pressure on free minded children destroys the free thinking capacity of the children. No one advise us to become 'a man' in the true sense of the term. So, parents afford their money on book-oriented education but not on true education. Institutions like Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia are offering true education right now. So, parents should try to send their children to these type institutions for their betterment also for the betterment of the society too. Only these type of institutions can imbibe right spirit in the boys. Education must be applied, it is not to be rotted. Object of our parents should be making their children of 'RANCHO' mentality. They should let their children do whatever they prefer to do with proper guidance. They must not force them about their careers. They can advise them but should not compel them. So, education must be imbibed in such a way that it can be applied in practical life.

বন্ধুত্ব

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

তোর কণ্ঠ থেকে আসে যে গান
জীবনে আনে খুশির বান।
চিরদিন তোর কণ্ঠে যেন
বজায় থাকে গানের মান।।

মোর জীবনের বার-দরিয়ায়
পিছলে গেলাম অকূল হাওয়ায়।
হারিয়ে গেলাম তোর মনেতে
তোর চোখের ওই মলিন চাওয়ায়।।

নরম করে মনের গদি
বন্ধু নামটা দিস্ বা যদি।
জীবনের এক নবীন তেজে
চলবে আমার মনের নদী।।

অঙ্কুরিত বীজের মত
পাষাণ ফুঁড়ে উঠতে চাই।
বাঁধনহারা মনবাগিচায়
গুছিয়েছি তোরই ঠাঁই।।
জীবন আমার বাধা হানে
তোর চোখের ওই করুণ টানে।
দেখলে তোর ওই মুখের হাসি
মন যে আমার জোয়ার আনে।।

আমি আমার মনকে শুধাই
তুই কি আমার হস্‌রে আপন?
তোকে দেখলে আমিই বুঝি
বন্ধুত্ব যে বীজের বপন।

দেখে তোর ওই সরল হাসি
মনে আমার জাগে যে বল।
বঙ্গভূমি বলে আমায়
চল এবারে ঘুরতে চল।।

দেখতে গিয়ে বঙ্গভূমি
মার স্নেহের ওই আঁচল চুমি।
আমার মায়ের সাজানো ঘর
এই তো আমার জন্মভূমি।।

মনের দুয়ার খোলা রাখিস।
মনের মাঝে ছবি আঁকিস।
ছোট হলেও তোর মনেতে
আমার একটু জায়গা রাখিস।।

বলছি তোকে শোন তাহলে
বহুকালের ইচ্ছে মনে,
আমি হতে চাই রে এমন
যে মরে গিয়েও বাঁচতে জানে।।

অনেক দুঃখ সয়েছি বন্ধু
তোকেই শুধু জানাতে চাই।
কষ্ট দিলে কেউ এ মনে
মন যে আমার জ্বলে রে ভাই।।

এই আগুনের তেজ আমাকে
লিখতে শেখায় কবিতা।
আমিই শুধু বুঝতে পারি
কাব্য হল উপলব্ধিতা।।

জীবন মানে বাঁচার মানে
আনন্দ আর কষ্ট।
কষ্ট পেলেই চোখ যে আমার
হয়ে ওঠে বড়ই সিক্ত।।

তাও বলি ভাই জীবন আমার
সত্যই স্বপ্নরঙিন।
বঙ্গভূমির লাবনীয়
সৌন্দর্যে বিলীন।।

জল

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

আমি জল।
যুগ যুগান্তে পৃথিবীর বুকে নামিয়েছি জীবনের ঢল।
দূষিত হয়েছি।
তবু জীবনদান করেছি।
দূষিত হয়ে পড়ে থেকেছি কত নদী নালা অথবা খালে,
তবু আশ্রয় দিয়েছি কত জীব, এই আমারও বুকের তলে।।

বহুবার সচেতন করেছি,
আমাকে অবহেলা কোরো না।
চেয়েছি প্রতিকার।
কিন্তু আজও জনজীবন সদাই নির্বিকার।।

নিজ দুর্বিষহ রূপের কত পরিচয় দিয়েছি,
তবু অবহেলা করো মোরে।
আজ আমি বিষন্ন।
নির্বিকার জনজীবনে দান করে হেন অন্ন।
জনজীবনে জাগিয়েছি বল।
আমি জল।।

পৃথিবীর ভূভাগে প্লাবিত করেছি কত ভূমি,
গ্রাস করেছি কত জনজীবন।
আমি দুর্বিষহ।
তবু ক্ষমা করেছি বারবার।
কিন্তু আমার বাঁধনহারা রূপের পরিচয় পেয়েও,
ভুল করেছ বারবার।।

তাই আজ আমি শেষ বারের মত সচেতন করি,
কোরো না আমায় অপচয়।
পৃথিবীপৃষ্ঠে হবেই হবে
মনুষ্য জাতির জয়।

পাখি

মুদ্রা (শ্রীধন্যা ভট্টাচার্য)

একটি গাছে অনেক পাখি
বসল ঝাকে ঝাঁকে
ওদের মধ্যে একটি যেন
আমার চোখে চোখ রাখে।

আমি বলি, বাড়ী কোথায়,
কোন্ গাছটায় থাকো?
তোমার মা, কোন্ পাখিটা
আমায় বলবে নাকো?

পাখি আবার এ ডাল ও ডাল
ঘুরে ঘুরে চলে
পায়ে পায়ে তিড়িং তিড়িং
ঠোঁটে কথা বলে।

আমি বলি সকাল হলো
ব্রেকফাস্ট টা পেলে
পাখি আমায় যেন বলে
সেরেছে গাছের ফলে।

আমি বলি পড়বে না তুমি
এবার বসে পড়ো,
ও আমাকে লেজ দেখিয়ে
বললে তুমি পড়া করো।

পাখি তোমার কত মজা
যেখানে খুশি যাও
কেউ তোমারে দেয় না সাজা
যখন যেমন খুশী খাও।

পাখি যদি হত আমি
আমি হতাম পাখি
বাঁধা কোনো থাকত না আর
কেবল খেলা খেলা
জানিনা তবে পাখিটার
কেমন কাটতো বেলা।

The Day

Raddur Samaddar

The morning shines
The morn wakes up,
The morning smiles
All the souls march.
The work will be done
As the work with fun,
The schedule is made
The itinerary is done.
Now we are ready,
like a team, lets have fun:

Exercise - done
Studies - done
School - done
Home works - done
Now our heart wants
to have a great time
with the story book,
which states the story of life.

Sleep my child'
good-night to all the cries,
at last in the end of the day.

The day was fun.
The day was done.

Path

Raddur Samaddar

Walk in the path,
shown by life.

Move to the direction,
opposite to a knife.

Love the moments,
all that is in life.

Let it be good, be
bad on be what it is.

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে
বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০

শ্রুতি আলেখ্য 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০
নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'

প্রবন্ধ, গল্প ও অনান্য

স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মা। পুরন্দর, তোমাদের অত্যন্ত কৃশ দেখাচ্ছে, যেন অনাবৃষ্টি দিনের পাতা-ঝরা বনস্পতির মতো। স্বর্গে কি অমৃত- সঞ্চয়ে দৈন্য ঘটেছে?

ইন্দ্র। পিতামহ, অনাবৃষ্টিই তো বটে। স্বর্গীয় বনস্পতির শিকড় আছে মর্ত্যের মাটিতে—দিনে দিন সেখানে শ্রদ্ধার রস শুকিয়ে এসেছে। নরলোকে কানাকানি চলছে, যে সৃষ্টি ব্যাপারটা আকস্মিক মহামারীর মতো, বসন্তের গুটি যেন, আপনা হতেই আপনাকে হঠাৎ ফুটিয়ে তোলে; এটা দেবতার হাতের কারুকার্য নয়। অর্থাৎ এটা এমন একটা রোগ, যা চলছে মৃত্যুর অনিবার্য পরিণামে। এমন-কি, ওখানকার পণ্ডিতরা চরম চিতানলের দিনক্ষণ পর্যন্ত অঙ্ক কষে স্থির করে দিয়েছে।

ব্রহ্মা। সর্বনাশ। এ যে অনাদিকালের ভূতভাবনের বেকার-সমস্যা।

ইন্দ্র। তাই তো বটে। ওরা বলছে, দেবতারা কোনোদিন কোনো কাজই করে নি অতএব ওদের মজুরি বন্ধ।

ব্রহ্মা। বলো কী, হোমনলের ঘৃতটুকুও মিলবে না?

ইন্দ্র। না পিতামহ। সেটা ভালোই হয়েছে—যে ঘৃতের এখন চলতি সেটাতে অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্য হবার আশঙ্কা।

বৃহস্পতি। আদিদেব, এতদিন ছিলুম মানুষের অসংশয় বিশ্বাসের—অত্যন্তই নিশিন্ত ছিলুম। এখন পণ্ডিতের দল মনোবিজ্ঞানের এক্কাগাড়িতে চাপিয়ে মানুষের মাথার খুলির একটা অকিঞ্চিৎকর কোটরে আমাদের ঠেলে দিয়েছে; সেখানে মগজের গন্ধ আছে, অমৃতের স্বাদ নেই; বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বেড়ার মধ্যে আমাদের ঘের দিয়ে দিয়ে রেখেছে—যাকে ম্লেচ্ছভাষায় বলে কন্‌সেন্‌ট্রেশন্ ক্যাম্প—কড়া পাহাড়া! অবতারের যে পুরতত্ত্ব বের করেছে, তাতে নৃসিংহের কোনো চিহ্ন নেই, আছে নৃবানরের মাথার খুলি।

মরুৎ। আমার পুত্র মারুতিকে ওরা অগ্রজ বলে স্বীকার করেছে এতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু লজ্জার বিষয় এই যে, দেবতারা ভুক্ত হয়েছে অ্যান্থপলজি নামক অর্বাচীন ম্লেচ্ছশাস্ত্রের বাল্যলীলা পর্বে। দেব, আশা দিয়েছিলে আমরা অমর, আজ দেখছি ওদের পরীক্ষাগারে ব্যাঙের একটা কাটা পা'ও ইন্দ্রপদের চেয়ে বেশি সজীব। সেদিন সুরবালকেরা সুরগুরুকে ধরে পড়েছিল, 'প্রমাণ করে দিন আমরা আছি'। গুরুর সন্দেহে দোলা লাগল—আছি কি নেই এই তালে তাঁর মাথা নড়তে লাগল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না। পিতামহ যদি সন্দেহ ভঞ্জন করে দেন তা হলে দেবলোক সুস্থ হতে পারে।

ব্রহ্মা। পিতামহের চার মাথা হেঁট হয়ে গেছে। মনে ভাবছি মরলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের আচার্য হয়ে জন্মাতে পারি তা হলে অন্তত কোনো এক চৌমাথার ট্রাম লাইনের ধারে একটা পাথরের মূর্তি দাবি করতে পারব। আজ আমার মূর্তির ভাঙা টুকরো নিয়ে প্রফেসর তারিখ হিসাব করছে অথচ এতদিন এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে আমি সকল তারিখের অতীত।

প্রজাপতি। ভগবান্, সকলেই জানেন ধরাধামে আমি আর কন্দর্পদেব অবতীর্ণ হয়েছিলুম শুভ এবং অশুভ বিবাহের ঘটকালিতে। সেজন্যে আমাদের কোনো রকমের নিয়মিত বা অনিয়মিত পাওনা ছিল না, কেবল নিমন্ত্রণপত্রের মাথার উপরে ছাপার অক্ষরে আমার উদ্দেশে একটা নমস্কার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু কৌতুক ছিল ভূরি-পরিমাণে। বাসর-ঘরে অনেকে কানমলা দেখেছি পরিহাস-রসিকাদের হাতে, আর দেখেছি অদৃশ্য পরিহাস-রসিকের হাতে চিরজীবনের কান-মলা। আমি প্রজাপতি আজ লজ্জিত, কন্দর্প আজ নির্জীব—তিনি পঞ্চশর নিয়ে যখন আস্ফালন করিতে যান তখন তীরগুলো ঠিকরে যায় কোম্পানির কাগজ-নির্মিত বর্মের পরে।

অতএব উক্ত বিভাগের সনাতনী খাতা থেকে আমাদের নাম কেটে নিয়ে টঙ্কেশ্বরী দেবীর নাম বহাল হোক।

সকলে। তথাস্তু।

বায়ু। পৃথিবীতে আজকাল পাগলা হাওয়া পলিটিক্সের ঈশান কোণ থেকে সৃষ্টি ছারখার করতে প্রবৃত্ত। আমি আজ চন্দ্রলোকে সমস্ত বিরহিণীদের দীর্ঘনিশ্বাস বহন করে ফিরে যেতে ইচ্ছা করি।

অশ্বিনীকুমার। সুবিধা হবে না দেব। মর্ত্যের পণ্ডিতেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, চন্দ্র বায়ুর প্রকোপ বৃদ্ধি করেন বটে, কিন্তু স্বয়ং তিনি বায়ুহারা।

বায়ু। না হয় সেখানে গিয়ে আত্মহত্যা করব।

ভোলেনাথ। (অর্ধনিমীলিত নেত্রে) আমার চেয়ে গাঁজার মৌতাত অনেক প্রবল, পৃথিবীতে এমন সর্বনেশে ওস্তাদের অভাব নেই—সেই-সব সংস্কারকদের উপর প্রলয়কাযের ভার

দিয়ে আমি গঙ্গাধারাভিষেকে মাথা ঠান্ডা করতে পারি। আমার ভূতগুলোর ভার তাঁরাই নিতে পারবেন।

চিত্রগুপ্ত। মনঃক্ষোভে দেবগনের অভিযোগে অত্যুক্তি প্রকাশ পেয়েছে। যথাযথ তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করি। সুরগুরু কোনাদিন সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি। সেইজন্যে দেবতাদের গণিত স্বেচ্ছাগণিত। মর্ত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণ- বিশারদের মাথায়; এ কাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি অত্যাবশ্যক।

বায়ু। এ প্রস্তাবের সমর্থন করি। দেবতাদের হতাশ হবার কারণ নেই। মানুষের বুদ্ধিতে অকস্মাৎ হাওয়াবদল বার বারই দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষত দুর্দিনে। দেউলে হবার দিনে মাতনের খরচ বেড়ে ওঠে। মানুষের বুদ্ধিতে সব সময় জোয়ার আসে না—একদা তলার পাঁক বেরিয়ে পড়ে। তখন পান্ডার পদপঙ্কের দাম চড়ে যায়, দেবতারাও তার অংশ পান।

বৃহস্পতি। আশ্বস্ত হলুম। (সরস্বতীর প্রতি) মুখ ম্লান করিবেন না, দেবী, মানুষের আত্মবুদ্ধির উপর শ্রদ্ধা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়তে থাকে। বুদ্ধিতে ভাঁটার টান প্রবল, ভূমণ্ডলে এমন দেশ আছে। শীতলা ঠাকরুনও সেই ভরসাতেই মন্দির-ত্যাগের আশঙ্কা ছেড়ে দিয়েছেন। *(অচলিত সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত)*

এক-চোখো সংস্কার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা-উপার্জন। বাল্যাবস্থায় সমাজের শত সহস্র বন্ধন থাকে, শত সহস্র অনুশাসনে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে তাহার দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য স্ফূর্তিকে দমন করিয়া রাখাই তাহার কল্যাণের হেতু। অবশেষে সে যখন বড়ো হইতে থাকে তখন একে একে সে এক একটি বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, শাস্ত্রের এক-একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়, লোকাচারের এক একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের তলে তলে গোপনে ছিদ্র করিয়া দেয় ও অবশেষে একদিন প্রকাশ্যে বারুদ লাগাইয়া সমস্তটা উড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বলে সংস্করণ। তাই বলিতেছি সংস্করণের নাম স্বাধীনতার প্রয়াস। গুটিপোকা যখন প্রজাপতি হইয়া তাহার রেশমের কারাগার ভাঙিয়া ফেলে তখন সে সংস্কার করে। মাকড়সা যখন আপনার রচিত জালে জড়াইয়া পড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য যুঝিতে থাকে তখন সে একজন সংস্কারক। দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্যসমাজ-সংস্কার সাপের খোলোস ছাড়ার মত একটা সহজ ব্যাপার নহে। খোলসের প্রতি এত মায়া মনুষ্যসমাজ ব্যতীত আর কাহারও নাই।

সন্তানকে শাসন করা, সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু-অবস্থার উপযোগী; কিন্তু সে অবস্থা অতীত হইলেও অনেক পিতা মাতা তাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক পালন করেন, তাহাদিগকে যথোপযোগী স্বাধীনতা দেন না। সন্তানের বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তন আছে, অথচ পিতা মাতার কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন নাই। ইহার ফল হয় এই যে, একদিন সহসা তাঁহারা দেখিলেন—সন্তান তাঁহাদের একটি আদেশ শুনিল না, মাঝে মাঝে এক একটা বিষয়ে তাঁহাদের অবাধ্যতা করিতে লাগিল। তাঁহাদের কখন এরূপ অভ্যাস ছিল না; বরাবর তাঁহাদের আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহার অন্যথা দেখিয়া তাঁহাদের গায়ে সহ্য হয় না। উভয় পক্ষে একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহাকেই বলে বিপ্লব। অবশেষে একে একে সে পিতা মাতার একটি একটি শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে থাকে, তাহার স্বাধীনতার সীমা পদে পদে বৃদ্ধি করিতে থাকে ও অবশেষে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—ইহাকেই বলে সংস্কার। বৃদ্ধ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, সন্তানদের অবনতি হইল; স্বাধীনতাই লাভ করুক, আর আত্মনির্ভরই শিখুক, আর আলস্যই পরিহার করুক, যখন গুরুজনের অবাধ্য হইল তখন আর তাহাদের শ্রেয়ঃ কোথায়? অবাধ্য না হইলেই ভাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংসারে যদি কোন মঙ্গল না বুঝিয়া না পাওয়া যায়, সকলি যদি কাড়িয়া লইতে হয়, কিছুই যদি চাহিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবাধ্য না হইয়া আর গতি কোথায়?

উপরের কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে কিছুই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বলিতে গেলে অধীনতা মাত্রই অশুভ, স্বাধীনতা মাত্রই শুভ। মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা—যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পায়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে

যথাসম্ভব স্বাধীনতা পাইতে গেলেই নিজেকে অধীন করিতে হয়। দুর্ব্বলপদ বৃদ্ধ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যষ্টির অধীনতা স্বীকার করেন। তেমনি রাজার (Government) অধীনে না থাকিলে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, আবার প্রজার অধীনে না থাকিলে রাজাও অধিক দিন স্বাধীনতা রাখিতে পারেন না। আমরা যথাসম্ভব স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে সমাজের শত সহস্র নিয়মের অধীনতা স্বীকার করি। যে ব্যক্তি সমাজের প্রত্যেক নিয়ম দাসভাবে পালন করে, আমরা তাহাকে প্রশংসা করি; যে তাহার একটি নিয়ম উচ্ছেদ করে, আমরা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই। এইরূপে অধীনতাকে আমরা পূজা করি এবং সাধারণ লোকে মনে করে যে—অধীনতা পূজনীয় কেননা সে অধীনতা; রাজার প্রতি অন্ধনির্ভর পূজনীয়, কেননা তাহা রাজভক্তি; সমাজের নিয়ম-পালন পূজনীয়, কেননা তাহা সমাজের নিয়ম। কিন্তু তাহা ত নয়। অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে অধীনতা স্বাধীনতার সোপান বলিয়াই তাহার যা গৌরব। সে কার্য্যের যখনি সে অনুপযোগী ও প্রতিরোধী হইবে তখনি তাহাকে পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত। আমাদের এমনি কপাল, যে, কণ্টক বিঁধাইয়া কণ্টককে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া উদ্ধার হইয়া গেলেও যে অপর কণ্টকটিকে কৃতজ্ঞতার সহিত ক্ষতস্থানে বিঁধাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজশাসনের আবশ্যক থাকিবে না বরং বিপরীত হইবে, তখন রাজাকে দূর কর, রাজভক্তি বিসর্জ্জন কর। যখন সমাজের কোন নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা-রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়মরক্ষার জন্য যে সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে এক অধীনতার হস্ত হইতে দ্বিতীয় অধীনতার হস্তে পড়িতে হয়। অসহায় স্যাক্সনেরা যেমন শত্রু অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রবলতর শত্রুকে আহ্বান করিয়াছিল—স্বাধীনতা পাইবার জন্য, অস্তিত্ব প্রবল করিবার জন্য, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উভয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছিল—সমাজেরও ঠিক তাহাই হয়। ইহাই সংস্কারের গোড়ার কথা।

এক দল লোক বিলাপ করিবেই বোধ করি এমন কাল কোন কালে ছিল না, যখন এক দল লোক স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে সর্ব্বনাশের, প্রলয়ের বীজ না দেখিয়াছে। সত্যযুগ কোন কালে বর্ত্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি কি হইতে ইচ্ছা করেন?' তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, 'আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি! 'ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল! কিন্তু কত শত সহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, 'আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি! 'ইঁহাদের পৌত্রেরাও আবার ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিবে। ইঁহাদের পিতামহেরাও তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিষয় লেখাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন, বিধবাবিবাহে আমাদের মত নাই; তবে, সংস্কার করিতে হয় ত বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার কর—তাহাদের উপবাস করিতে না হয়, তাহাদের মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ না থাকে, বেশবিন্যাস বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছাকে অন্যায় বাধা না দেওয়া হয়। এক কথায়, বিধবাদের প্রতি সমাজের যত প্রকার অত্যাচার আছে তাহা দূর হউক, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিধবারা সধবা হইতে পারিবে না। তাঁহারা বলিলেন, —'অসবর্ণ বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু অনুরাগমূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। পিতামাতাদের দ্বারা বধূ নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রণয়াকৃষ্ট বিবাহেচ্ছুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী স্থির করে ত ভাল হয়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহ নৈব নৈবচ।' তাঁহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দেন। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতাকে ডরান। লোকাচারবিশেষের উপর তাঁহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ। তাঁহারা বুঝেন না যে, সেই অনুষ্ঠানগুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ। তাঁহারা যাহা বলেন তাহার মর্ম্ম এই—'সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যত অনর্থের মূল। আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা, গাছটি বাঁচিয়া থাক্!'

যদি তুমি বিধবাবিবাহ দিতে প্রস্তুত না থাক, তবে বিধবারা যেমন আছে তেমনি থাক্। সমাজ যে বিধাবাদের উপবাস করিতে বলে, মাছ মাংস খাইতে—বেশভূষা করিতে নিষেধ করে, তাহার কারণ সমাজের খামখেয়ালী অত্যাচারস্পৃহা নহে। সমাজ বিধবাদিগকে বিধবা রাখিবার জন্যই এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যদি তুমি চিরবৈধব্য ব্রত ভালবাস, তবে আর এ সম্বন্ধে কথা কহিও না। তুমি মনে করিতেছ ঐ বাঁকাচোরা শিকড়গুলা গাছের কতকগুলা অর্থহীন গলগ্রহ মাত্র; তাহা নয়—উহারাই আশ্রয়, উহারাই প্রাণ। যদি অসবর্ণ

বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে, তবে পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিও না। ইহা সকলেই জানেন, অনুরাগের হিসাব-কিতাবের জ্ঞান কিছু মাত্র নাই। সে, ঘর বুঝিয়া, দর করিয়া, গোত্র জানিয়া পাত্রবিশেষকে আশ্রয় করে না। তাহার নিকট রাঢ় বারেন্দ্র নাই; গোত্র-প্রভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। অতএব অনুরাগের উপর বিবাহের ঘটকালি-ভার অর্পণ করিলে সে জাতি বিজাতিকে একত্র করিবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব, হয়, অসবর্ণ বিবাহ দেও, নয়, পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিবাহভার থাক্। কিন্তু এই পরাধীন বিবাহপ্রথা রক্ষা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরো অনেকগুলি আনুষঙ্গিক প্রথা রক্ষা করিতে হয়। যেমন বাল্যবিবাহ ও অবরোধপ্রথা। যদি স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে পায়, ও অধিক বয়সে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইবেই। যখন যৌবনকালে কুমার কুমারী-যুগলের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবে, তখন কি পিতামাতার ও চিরন্তন প্রথার নীরস আদেশ তাহারা মান্য করিবে? তাহা ব্যতীতও বাল্যবিবাহের আর একটি অর্থ আছে। বালককাল হইতে দম্পতির একত্রে বর্দ্ধন, একত্রে অবস্থান হইলে, উভয়ে এক রকম মিশ খাইয়া যায়, বনিয়া যায়। কিন্তু যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বয়স্ক, উভয়েরই যখন চরিত্র সংগঠিত ও মতামত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ও কচি-অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে ও পাকা-অবস্থার দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, তখন অমন দুই ব্যক্তিকে অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুতেই জুড়িতে পারে না—না বাসসামীপ্য, না বিবাহের মন্ত্র। তাহাদের যতই বলপূর্ব্বক একত্র করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহারা দ্বিগুণ বলে তফাৎ হইতে থাকিবে। অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে দ্বিগুণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব যদি অসবর্ণ বিবাহ না দেও তবে পূর্ব্বরাগমূলক বিবাহ দিও না, বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাক্, অবরোধপ্রথা উঠাইও না। তুমি যে মনে করিতেছ, 'সুবিধামত আমি সমাজ হইতে লোকাচারের একটি মাত্র ইঁট খসাইয়া লইব, আর অধিক নয়', তোমার কি ভ্রম! ঐ একটি ইঁট খসিলে কতগুলি ইঁট খসিবে ও প্রাচীরে কতখানি ছিদ্র হইবে তাহা তুমি জান না।

অতএব দেখা যাইতেছে দুই দল লোক সমাজ সংস্কার করে। এক—যাহারা লোকাচারকে একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করে, আর—যাহা লোকাচারের একটি একটি করিয়া শিকড় কাটিয়া দেয় ও অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া বলে, 'এ কি হইল। গাছ শুকাইল কেন?' ইহাদের উভয়েরই আবশ্যক। প্রথম দল যখন কোন একটা লোকাচার আমূলতঃ বিনাশ করিতে চায়, তখন সমাজ কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই বলিয়া যে সংস্কারকদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হয় তাহা নহে। তাহার একটা ফল থাকিয়া যায়। মনে কর যেখানে অবরোধপ্রথা একাবারে তুচ্ছ করিয়া পাঁচ জন সংস্কারক তাঁহাদের পত্নীদিগকে গাড়ি চড়াইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যান, সেখানে দশ জন স্ত্রীলোক পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় দরজা খুলিয়া রাখিলেও তাঁহাদের কেহ নিন্দা করে না। কেবল মাত্র যে তাঁহাদের নিন্দা করে না, তাহা নহে; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া সকলে বলাবলি করে, 'হাঁ, এ ত বেশ! ইহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই! কিন্তু মেয়ে মানুষে গাড়ি চড়িবে সে কি ভয়ানক! 'আপত্তি যে নাই, তাহার কারণ, আর পাঁচ জন গাড়ি চড়ে। নহিলে বিষম আপত্তি হইত। সমাজ যখন দেখে দশ জন লোক হোটেলে গিয়া খানা খাইতেছে, তখন যে বিশ জন লোক ব্রাহ্মণকে দিয়া মুরগী রাঁধাইয়া খায়, তাহাদিগকে দ্বিগুণ আদরে বুকে তুলিয়া লয়। ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শীগণ। আমূল-সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে, 'দেখ দেখি, তোমরাও যদি এইরূপ অল্পে অল্পে আরম্ভ করিতে, সমাজ তোমাদেরও কোন নিন্দা করিত না।'

এক কালে যে লোকাচারের প্রাচীরটি আশ্রয়স্বরূপ ছিল, আর এক কালে তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়ায়। এক দল কামান লইয়া বলে, 'ভাঙিয়া ফেলিব।' আর-এক দল রাজমিস্ত্রির যন্ত্রাদি আনিয়া বলে, 'না, ভাঙিয়া কাজ নাই, গোটাকতক খিড়্কির দরজা তৈরি করা যাক।' অমনি সমাজ হাঁপ ছাড়িয়া বলে, 'হাঁ, এ বেশ কথা!' এই রূপে আমাদের অসংখ্য লোকাচারের প্রাচীরে খিড়্কির দরজা বসিয়াছে। প্রত্যহ একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে; অবশেষে যখন দেখিবে তাহার নিয়মসমূহে এত খিড়কির দরজা হইয়াছে যে তাহার প্রাচীরত্ব আর রক্ষা হয় না, তখন সমস্তটা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর আপত্তি করিবে না, এমন-কি, তখন ভাঙ্গিয়া ফেলাও আর আবশ্যক হইবে না। এইরূপে এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যতটা সমাজসংস্কার করেন, এমন অল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইঁহারা রক্ষণশীলদলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।

(অচলিত সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত)

নির্জলা সত্য

অধ্যাপক ডঃ মধুসূদন ভট্টাচার্য্য

আমি লোকটা নিশ্চয়ই খারাপ, কতটা যে তা আপনারা জানবেন কি করে। ভাল নীতি কথা বলি, মৃদু হাস্যেই বেশি সময়ে। লোকের আপদে বিপদে ছুটে যাই জায়গামত, সংবাদপত্রে বড় করে ছবি ছাপে। কাউকে আশার আলো দেখাই নে, একথা আমার অতি বড় নিন্দুকেও বলবে না। আমি এক কল্পতরু।

আমার বিবেক বলে, তুই একটা পৃথিবীর জঞ্জাল, সুগন্ধির আড়ালে আছে তোর আসল আমি।

চম্‌কে উঠি আমি। তাহলে আমার ভেক সবাই ধরে ফেলেছে! ঠিক আছে সোনার ঝাঁটায় ওদের মোসাহেব বানাব। দেখছি শুধু হাসি, শুধু আশা—এসব দিয়ে এখন আর চলবে না বুঝছি।

কে যেন নেপথ্যে বলে ওঠে, চলবে চলবে এখনো বেশ কয়েক বছর, আরে বাবা তুমিই বা কতদিন। জীবন তো ছোট, মনে রেখো একটাই তো জীবন।

কে তুমি, কি বলতে চাইছো?

তোমরা আমাদের নেতা, সব তো বোঝাই আছে তোমাদের। দেশ জনগণের। তোমরাও তো জনগন। সুতরাং দেশটা তোমাদের, তার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব তোমাদের সম্পত্তি।

হ্যাঁ ভাই, এটা কিন্তু সঠিক বলেছ। তাই আমরা আমাদের সম্পত্তি, দেশের নিরাপত্তা আর দেশের যা মূল্যবান কিছু আছে তা সুরক্ষিত রাখার জন্য সত্বর ব্যবস্থা নিই, সব ভল্টে রেখেছি এবং রেখেই চলেছি; কত ক্লেশ স্বীকার করি বার বার বিদেশ গিয়ে ওখানে ব্যাঙ্কের বন্দোবস্ত পাকা রাখতে!

কি সব ভাবছে অভিষেক! কেন সব আজে বাজে চিন্তা অলস মস্তিষ্কে ইদানীং চুলবুল করে।

অলক্ষ্যে কে যে বলে ওঠে, সংবাদপত্র পড়ার দরকার কি, যা হচ্ছে এসব মহাকালের খেলা, চিরকাল চলবে, অতীতেও ছিল এসব।

সমে ফেরে অভি। কোথায় যাব যেন, মনে আসে না। এত ভুলো মন তো তার ছিল না। হাসি পায় তার, আরে এও তো সেই মহাকালের খেলা।

কালকে বাঁধতে পারে না কেউ ঠিকই। তা বলিই বা কিভাবে? ঐ যে তোমাদের গোঁফদাড়িওলা লোকটা, চেহারাটা কিন্তু বেশ এক্কেবারে ঋষি, হ্যাঁ গো রবিঠাকুর, সময়কে যেন স্থির করে দিয়েছেন। আর একটা বিরাট সর্বনাশ করে দিয়েছেন, করে চলেছেন বোধহয় ঠিক বলা হয়, বিশেষ করে ভাবি কবিকুলের, তাঁরা আর কি নিয়ে যে কবিতা লিখবেন ভেবেই অস্থির। এই কি ওঁর ঋষিসুলভ আচরণ!

অভি তো নিজেওভাবে দু-একটা কবিতা লেখার। কিন্তু কি আর হবে সে দুয়ার রুদ্ধ যে।

অনিমেষ এসে হাজির দুয়ারে, কলেজবন্ধু। কিরে বেরোবি, না বাড়ীতে বসে থাকবি?

সেটাই ভাবছি।

আরে তুই ছিলিস এতো ডাইন্যামিক আর এখন এক্কেবারে স্ট্যাটিক হয়ে গেলি। চল্‌না কত জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে, চল একটাতে যাই।

নারে, যেতে ইচ্ছে করছে না।

কেন?

কবি তো উপলক্ষ্য মাত্র, নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার এমন সাড়ম্বর পরিবেষ্টন পাবে কোথায়? মন্ত্রীসান্ত্রীর সঙ্গে একটু ছোঁওয়াছুয়ি, ভাগ্যান্বেষনের কি দুরন্ত প্রতিযোগিতা বিদ্বৎজনেদের মাঝে যে চলে!

দেখ অভি, তোর কথার মধ্যে কিছুটা সত্য আছে, এটা ঠিক। তবে কবিগুরুর মননস্মরণও কিছুটা প্রভাবিত করে মানুষকে।

নিশ্চয়ই করে, তবে তা মুক্তস্থানে কর্পূর, বড় ক্ষণস্থায়ী রে। দার্শনিক হলি কবে থেকে?

কি যে বলিস, বিজ্ঞানই বুঝিনে ভাল করে।

দর্শনের সঙ্গে আবার বিজ্ঞানের.....

আছে আছে। Where Science ends, Philosophy begins পড়েছিস তো নিশ্চয়

'আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার সৃষ্টি হতো মিছে'

দেখছিস কবি বিধাতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমি আছি তাই তোমার সৃষ্টি সুন্দর। তাই 'এই আমাকে' লালন করতেই হবে তোমাকে, না হলে তোমার অস্তিত্বেরই সংকট।

অনিমেষ কি যেন ভাবে। তাকে কতদূরের মনে হচ্ছে অভির। এ অনিমেষকে সে চেনে না।

কি হল দু'বন্ধু যে একদম চুপ, অভির স্ত্রীর কণ্ঠ। আসছি চা নিয়ে।

চা কি বানানো হয়ে গেছে?

না, গ্যাসে কমিনিটিই বা লাগবে?

চা তো বাড়ী থেকে খেয়ে এলাম, তার চেয়ে বসুন একটু গল্প করা যাক।

কিন্তু হায় গল্প কোথায়। মন হারিয়ে যায় অতীতে। মধুর সে স্মৃতির সুবাস পাচ্ছি যেন। ভীষণ আনমনা লাগে অনিমেষকে। সে দেখছে সেই পূর্বাকে, সুন্দরী তন্বী মেজাজি। এখন তার সুমুখে বসে সেই পূর্বা! কালের গ্রাস কি ভীষণ ছায়া ফেলে!

ঝর্ণা কি রকম আছে? একদিন তো সস্ত্রীক আসতে পারেন, এখন তো ঝাড়া হাত-পা, অখন্ড অবসর আপনাদের।

কথাটি কিন্তু বড্ড সত্যি, হজম করতে সময় লাগে। তা এলেই হয়, এ আর এমন কি, এটুকু তো পথ।

আপনাদের ধরণধারণ দেখে মনে হয় .....

কি মনে হয় বলুন শুনি, মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু বলবেন।

আপনি দিল্লী, আমার উনি মুম্বাইবাসী।

আবার দিল্লী, দিল্লীর লাড্ডু যো খায়া ....

কেন?

মনে নেই কালীবাড়ির জলসংকট! এবং আপনার একতলা তিনতলা করা প্রতি সকালে, হাতে মগ?

তবু তো বেশ ছিলাম তখন। তরুণ রক্ত, ওসব ঘটনা আনন্দ-ভ্রমণে কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। এখন পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ যায় খিঁচড়ে।

এখন চুন তো খস্‌ছেই আর সে পান অন্য পানে বাড়বাড়ন্ত।

কিন্তু জীবন চলছে চলবে। এ প্রবাহমান নদী, কখনো উচ্ছল দুরন্ত, বিশাল তার বিস্তার, কখনো বা নিতান্ত শীর্ণকায়া সে। কোথাও ভাঙছে কোথায় জাগছে।

এই জীবনমৃত্যু প্রবাহ সমান্তরালভাবে চলেছে চিরকাল। ভারসাম্য রাখছে প্রকৃতি তার নিজস্ব নিয়মে, তার জন্য সে মানুষের তোয়াক্কা করে না একটুও।

প্রকৃতি ব্রহ্ম, তা চিরস্থায়ী, সে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার রূপ পরিবর্ত্তন করে—সভ্যতা আসবে যাবে, প্রানীকূল বৃক্ষলতার রূপান্তর ঘটবে, কখনো তার কোনো অংশের বিলুপ্তিও বা তাপে চাপে সময়ে আবার তৈলভান্ডার বা অন্য জ্বালানির উদ্ভব হবে হয়তো কিংবা দূরাগত কোনো সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে আবার হাজার হাজার বছর ধরে।

কি হল, আপনি কি এত ভাবছেন?

সত্যি কি সব যে উদ্ভট চিন্তা পেয়ে বসে আমাকে। লোককে বলি বর্তমানে বাঁচো, কিন্তু নিজে তা অনুসরণ করতে পারি না।

অভি টিপ্পনী কাটে, আরে তুই তো এবার নেতা হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিস রে।

নারে এ চিন্তায় শক্তি যোগায় না, বরং উদাসী কোরে তোলে মানুষকে।

রাখতো ওসব। এখান যাবার বেলায় এসব করে কি লাভ।

আমার তো কোনো আলাদা অস্তিত্বই নেই রে অভি। আমাদের এই সমাজ, এই সভ্যতা অনেক দিয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত; তো এই সভ্যতার ধারকবাহক যে প্রকৃতি-মা তার ওপর কি আমরা নিত্যনতুন পীড়ন চালাচ্ছি না? আবার সে সব নিয়ে বড় বড় সভাসমিতি করছি বিশ্বময়, কিন্তু তার নিট ফল জিরো। যা চলছে চলবে এবং সময়ের সাথে মানুষ প্রকৃতিকে আরো বেশি বেশি লুঠ করে চলেছে।

অভি যোগ করে, আরো চাই, চাই আরো আরো ভোগসামগ্রী।

ছাড়ুন তো আপনাদের এইসব চিন্তার বিলাসিতা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেছে। একটা ঋতু বদল ঘটতে চলেছে, বর্ষার উত্তরণ শরতে পঞ্জিকা মাফিক আর প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টার অপেক্ষায়। আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। দেবী আরাধনা-ঘণ্টাধ্বনি বিকিকিনির বাজারে ইতিমধ্যেই পুরোদস্তুর হাজির এবং বন্যার তান্ডবও চলছে সমানে বেশ কয়েকদিন। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া, বহু জলবন্দী। ত্রাণসামগ্রীর ওপর নির্ভর করে বাঁচতে হচ্ছে বহু সম্পন্ন পরিবারকেও। বন্যা মাঝে 'ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান'। তাই কি কখনো হয়, যারা বন্যা কবলিত নয় তাদের কি দায় পড়েছে। বিশ্বায়ন করেছে আমাদের ভোগবাদী, চরম সুবিধাবাদী। অনেক বিশেষণে বিভূষিত করা যায়। এক কথায় বলা যায় তা মানুষকে করেছে অমানুষ, না-মানুষ ভাবলে বিভ্রমের শিকার হতে হবে কিন্তু।

অনিমেষ ভাবে, এতো তার পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বেদনাক্ত হয় তার মন। ব্যাস, এতো কয়েক লহমার জন্য। এতো বিরাট হিপোক্রেসি। এই হিপোক্রিটরাই রাজত্ব চালাচ্ছে পৃথিবীময়।

বন্যা খরা ভূকম্প আরো কত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই কত জনকে বানায় বিত্তশালী, প্রতিষ্ঠিত করে রাজনীতির অঙ্গনে। খাদ্যশস্য প্রচুর মজুত। কিন্তু জোটেনা বহু বহু জনের। কোনো বস্তুরই অভাব নেই এই বিশ্বায়ত ভারতে, তবু কেন এত দারিদ্র, এত লোককে অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে হয়? কোন সরকারই অবশ্য একথা স্বীকার করে না, বলে অপুষ্টিতে মৃত্যু।

অনি নিজে আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায় ইদানীং প্রায় সর্বক্ষণই, এমনকি স্বপ্নেও সে দেখে ঐ একই দৃশ্য।

বেশ স্বপ্নবিলাসিতা, এপাশে মজা লুট্‌ছো। কত আর লুটবে, শরীরস্বাস্থ্য যায় দেয় না সময়ে অসময়ে। কোথা থেকে স্বরটা ভেসে আসে।

ইদানীং স্নানে এই ছেঁড়া প্রায় টার্কিশ টাওয়েলটা অনেক কথা স্মৃতিপটে নিয়ে আসে, সপ্তাহে দুদিন পালা করে এটির শুভাগমন ঘটে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীকা, অপরদিকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট থেকে আসাম চেরাপুঞ্জী ভ্রমণের বিশ্বস্ত সঙ্গী। সপ্তাহে ঐ দুদিন আমার ভ্রমণ হয় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, বিনাব্যয়ে বিনাক্লেশে। অনিমেষের।

কত কথা মনে আসে! কাশ্মীর শ্রীনগর বাস টার্মিনাস। দেখি একটা প্ল্যাকার্ড, আমার নামাঙ্কিত। কাছে যাই।

স্যার আসুন।

কোথায়?

গাড়ি আছে ঐ যে।

বুঝি, এ ঈশ্বরের অযাচিত করুণা।

গাড়ি ছোটে প্রায় মাইল ১৫/২০ (২৪/৩২ কিমি প্রায়) হবে। হজরতবাল সংলগ্ন প্রায় বলতে গেলে ডাললেকের ধারে এক সুদৃশ্য ছিমছাম অতিথিশালায়, সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। আগেই বাথরুম পরিদর্শন করা আমার স্বভাব, টিপটপ সব। দুটি ঘর, বেশ প্রশস্ত বেডরুম, সুমুখে ডাইনিং স্পেসও বেশ প্রশস্ত।

ড্রাইভার আমাদের যার কাছে সমর্পণ করে গেছে সে একজন মধ্যবয়সী কাশ্মিরী, দেখতেও সুদর্শন। সেই এই অতিথিশালার সব, পরিচারক, কুক ও ফরাস এবং তার পোষাকের ধবলত্বই তার রুচির পরিচায়ক।

একটু চা টা পাওয়া যাবে এখেনে?

বসিয়ে এসেছি স্যার। এই বলে সে নীচতলার দিকে ধাবমান দেখে মনে হয় পাকশালা ওখানে নিশ্চয়।

আমার স্ত্রীর মুখ গম্ভীর, খুব অপ্রসন্ন।

কি হলো?

এ ছাই কোথায় থাকতে এলে?

পুত্রকন্যাশ্যালক—তাদের কোনো হেলদোল নেই। প্রশস্ত পরিসর পেয়েছে অনেকটা পথযাত্রার পর, তারা নিজেদের নিয়ে মগ্ন।

ট্রে হাতে হাজির আমাদের অল-ইন-ওয়ান। চা, দু-তিন রকমের বিস্কুট, খানিকটা কাজু, টিপটে চা, দুধ চিনি আলাদা পটে। একটা ফ্লাক্সে গরম জল, ওরা বলে পানি, আর হরলিক্সের মত একটা কি যেন বাচ্ছাদের যদি প্রয়োজন হয়।

আবদুল, এতো সব কি আনলে?

মাইজীই সব ব্যবস্থা করেছেন।

ভাবি, মাইজী সে কোন জন। প্রশ্নটা করেই ফেলি আবদুলকে।

রাতের খাবার?

সব ব্যবস্থা আছে, খানা কি এখানে আনবো? নীচেও সব বন্দোবস্ত আছে। আমি পাশেই থাকি কোয়ার্টারে। ফোনে জানাবেন সময় হলে স্যর।

চা টা খেয়ে সবাই বেশ চাঙ্গা হল, মানে আমরা স্বামী-স্ত্রী—ছেলেরা তো সর্বদাই চাঙ্গা ভ্রমণপথে, পদব্রজেও তারা সমান দীপ্ত।

এই অতিথিশালা থাকার জন্য খুব সুখকর সন্দেহ নেই। কিন্তু শ্রীনগর থেকে এতটা পথ উজিয়ে যাওয়া আসে করা! আর বড্ড নিরালা। লোকজনের দেখা মেলা ভার, স্ত্রীর উক্তি।

কেন ব্যালকনিতে যাও। শান্তজল বিস্তীর্ণ বিশাল ডাল লেক, কত শিকারা, দেখোনা, নৌকা করে কেমন ভাবে ভ্রমণার্থীরা অস্থায়ী বাসায় যাওয়া আসা করছে। ঐ দেখ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হজরতবাল, ঐখানে মহম্মদের পবিত্র কেশ রক্ষিত আছে, সব আমাদের ঢিলছোঁড়া দূরত্বের মধ্যে। ক...ত দর্শনার্থী আসছে যাচ্ছে।

যত সুন্দরই হোক, আমরা তো বসে থাকতে আসিনি এখানে হাওয়া বদলের জন্য।

সে তো ঠিকই। দেখি কি করা যায়?

দেখাদেখির কি আছে, কালই আমরা শ্রীনগরে হোটেলে উঠবো।

বিধাতা বোধহয় মৃদু মৃদু হাসেন।

ভোর হতে না হতেই অনিমেষ ছুট্‌ছে অধ্যক্ষের কোয়ার্টার।

তখন স্বামী স্ত্রী মর্নিং-টিয়ে বসেছেন বোধহয় সবে মাত্র।

ডঃ হান্ডা আমায় বাড়ীর সম্মুখস্ত উদ্যান গেটেই দেখেছেন বোধহয় ইতস্ততঃ করতে।

হাসিমুখে এগিয়ে আসেন, বলেন, আসুন আসুন, এত সকালে যে?

ওঁর স্ত্রী কখন অলক্ষ্যে ওনার স্বামীর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। উনি যেন এটা জানতেন।

ডঃ হান্ডা বলেন, কি যে বল তুমি!

আরে ওনাকে আসতে দাও ভেতরে।

সরি সরি ভেরি সরি, আসুন আমাদের চা-সঙ্গ দিন।

কুশল বিনিময় হয়।

কথাবার্ত্তায় খুব আন্তরিক। আমি অপরিচিত একজন, এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। ভাবি বেশিভাগই ভাল মানুষ। হবেও বা আমার শোনা দেখার ভুল।

শ্রীমতি বলেন, যার জন্য এসেছেন উনি তার তো সব ব্যবস্থাই করে রেখেছো তুমি, তাই না?

আমি কিছু অনুমান করতে পারি না।

হ্যাঁ, শুনুন আপনি আমাদের এখন অতিথি। দর্শনীয় যা আছে কাশ্মীরে সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে।

আমরা তো বেড়াতে এসেছি, তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের গেষ্ট হবো কি করে।

একদিন ঘণ্টাখানেকের প্রোগ্রাম আছে আপনার, আপনার specialised subject.

ভাবি, ও হরি, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, পাঁচ' ছ দিন তো থাকছি মোটে। সময় খুব কম। তাই...

তা'তো অবশ্যই, তাই একদিন সন্ধ্যার পর...।

দেখুন আমার বিবেক এতে সায় দিচ্ছে না, এটা যেন ঠিক হবে না।

আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে, বলেন শ্রীমতি।

হান্ডাসাহের বলেন, আপনার যাতায়াতের কোন সমস্যা হবে না, আমরা গাড়ীর ব্যবস্থা রেখেছি।

দেখুন, ধন্যবাদ দিলে ছোট করা হবে আপনাদের, কিন্তু আমার একটা নিবেদন আছে, এটা আমার বিনীত অনুরোধ।

সেটা কী? দুজনেই একসঙ্গে বলেন।

বলি, লেকচার প্রোগ্রামটা বাদ দিন, আর আমাদের সাইট সিয়িং-র ব্যাপারগুলো বাসেই করতে ভাল লাগবে আরো অন্যান্য ভ্রমণকারীদের সঙ্গে। তবেই না বেড়ানো, হৈ হল্লা, চেঁচামেচি এ না হলে চলে নাকি বিশেষতঃ আমাদের, বাঙালীদের?

হান্ডাসাহেব হেসে বলেন, ঠিক আছে। Local sight seeing-টা আমরাই করাব আজই কিন্তু দশটার মধ্যে রেডি হয়ে থাকবেন, গাইড সমেত গাড়ি যাবে।

শ্রীমতী সহায্যে বলেন, এখান থেকে শ্রীনগর যাতায়াতের চিন্তা করতে হবে না একদিনও কিন্তু।

আর সব ব্যবস্থা আবদুলই করে দেবে। যখন যা প্রয়োজন ওকে জানাবেন।

নমস্কার বিনিময় করে ফিরি।

বাচ্ছারা খেলায় মত্ত, আমার শ্রীমতী অগ্নিশর্মা, সুটকেস গোছানো সারা।

বাক্যবান ছুটে আসে, আর কখন যাবে শ্রীনগরে? একটা দিন এভাবে কাটাবে নাকি?

চড়া গলায় কথা বললে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা। বলি, না না চলো, আবদুলকে Taxi আনতে পাঠাচ্ছি।

ইতিমধ্যেই আবদুল এসে হাজির। আপনাকে চা দিই স্যার? মা'জী ও ছোটরা একটু আগে...

না আবদুল, আমি চা খেয়েছি Principal সাহেবের বাড়িতে।

কি হল, তুমি Taxi আনতে বলবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো বলে থেমে থাকি।

আবদুল বোধহয় ইতিমধ্যেই সব ব্যাপারটা জেনে গেছে, তাই বলে, আমি নীচে আছি, ফোনে ডাকবেন সময় মত।

স্ত্রীর মেজাজ সপ্তমে বুঝতে পারি।

তখন সব ঘটনাটা খুলে বলি আদ্যন্ত।

মুহূর্ত্তে পরিবেশটা বদলে যায়। ছেলেদের বলে, তোরা তাড়াতাড়ি চানটান যা করবি করে নে, একেবারে রেডি হয়ে যা।

কি মধুর স্মৃতি। তখন ছিল দুরন্ত যৌবন আর অর্থের প্রাচুর্য্য না থাক, অনটন ছিল না।

এখন বয়সে প্রবীন, তার ছাপ অবশ্যই কিছু পড়েছে। সংবাদপত্র পড়ে মনে হয় দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে, আর নীচে নামার বিশেষ জায়গা নেই। শুধুই scam এর খবর, সচিত্র। বৈদ্যুতিন মাধ্যমও সোচ্চার। তবে কি কোনো ভালো মানুষজন আর দেশে নেই, তবে তা প্রচারে প্রচন্ড অনীহা, মুচমুচে খবর তো নয়। মানুষ খাবে না, ব্যবসা চালায় তারা। আর সংবাদ থাকে গালভরা promise-এর আমাদের নেতাদের জনগণের জন্য। নেতাদের অমৃতভাষণের ব্যবসায়ী বলা যাবে না, তারা সত্য কথা বলেন আমাবস্যা পূর্ণিমায়।

আমার অন্তরলোক আমাকে প্রশ্ন করে, তুমি কি বাপু সত্যবাদী? Scam করার অবকাশ পেলে তুমি কি করতে? তুমিও তো সুযোগ নিয়েছ কত সময়।

আমি রুষ্ট হয়ে বলি, প্রমাণ দাও একটা।

এইতো শ্রীনগরে থাকলে, গাড়ীর সুযোগ নিয়েছো, তার জন্য মাসুল দিয়েছিলে?

না, তা দিই নি।

তাহলে?

এই একটা বড় সুযোগ পাচ্ছে দেশের সরকার বাহাদুর CBI তদন্তের! কেন অযথা বড় বড় scam-এ মাথা গলানো, যা বেরোবে তা ঠিক করাই তো আছে, নেতারা রয়েছেন না! তাহলে কেন শুধুমুধ CBI তদন্তের বিরাট বিরাট ব্যয়? একটু গড়বড় করেন ন্যায়ালয় মাঝে মধ্যে এই যা।

কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তর তো দিলে না।

সব সময় সত্য বলেছি! আমি কি মহাত্মা গান্ধী? আর ছোটখাটো scam এর সুযোগ ছিল, সৎ(!) সাহসের অভাবে কাজে লাগাতে পারিনি। স্বীকার করি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদ্বজ্জনেদের মতো (আমি অবশ্য নিজেকে বিদ্বজ্জন মনে করি না) আমিও Opportunist Party of India (O.P.I.)র সভ্য।

আমি লোকটা যে চরম সুবিধেবাদী, এটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে, তবু যে নেতা হতে পারিনি, এ এক দুস্তর লজ্জা। নিশ্চয়ই Genetic disorder!

পথ দেখালেন আনন্দ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

বৌদ্ধ সাহিত্য একটা বিরাট নাটকের মতো। অজস্র চরিত্র, অজস্র ঘটনা, অজস্র সুখ-দুঃখের গল্প। বুদ্ধ তার কেন্দ্রে। তাঁকে ঘিরে অনেক ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, রাজা-প্রজা, শ্রেষ্ঠী-দাস।

এত লোকের মধ্যে আমার কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে আনন্দকে। বুদ্ধের তিনি সেবক মাত্র। তবু বুদ্ধ যেন তাঁকেই একটু বেশি ভালোবাসেন। ইচ্ছে করেই কোনো কোনো উপদেশ তিনি সংক্ষেপে বলেন—ভিক্ষুরা যাতে আনন্দ-র কাছে তার ব্যাখ্যা শুনতে যান। তাঁরাও ফিরে এসে জানাতেন আনন্দ কী বললেন। আর বুদ্ধও সেই সুবাদে আনন্দ-র বিদ্যেবুদ্ধির সুখ্যাতি করতেন।

একটানা পঁচিশ বছর বুদ্ধের সঙ্গে ছায়ার মতো ছিলেন আনন্দ। ছায়ার মতোই দাবিহীন। সেবক হওয়ার সময়েই তিনি কয়েকটা শর্ত দিয়েছিলেন। যেমন, বুদ্ধ তাঁকে কোনো ভালো খাবার বা কাপড় দিতে পারবেন না, তাঁর জন্যে কোনো আলাদা গন্ধকুটির (থাকার জায়গা) ঠিক করবেন না, নেমন্তন্নে যাওয়ার সময়ে তাঁকে সঙ্গে নেবেন না। নইলে লোকে বলবে, এই জন্যেই তো আনন্দ বুদ্ধর সেবক হয়েছেন!

সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা শর্ত ছিল। যেমন, কোনো ব্যাপার বুঝতে না পারলে তিনি সরাসরি বুদ্ধের কাছেই তা জানতে চাইবেন। কোনো উপদেশের সময়ে তিনি যদি হাজির থাকতে না পারেন, তাহলে ফিরে এসে বুদ্ধ আবার তাঁকে সেইসব কথা বলবেন।—এসব সুযোগ-সুবিধে না থাকলে লোকে বলবে: বুদ্ধের সেবা করে আনন্দ-র কী লাভ হচ্ছে। আর, এগুলো থাকলে লোকে তাঁকে বিশ্বাস করবে। বলবে, আনন্দকে বুদ্ধ সত্যিই কদর করেন।

এই সব শর্তই মেনে নিয়েছিলেন বুদ্ধ।

কালের নিয়মে বুদ্ধও একদিন পরিনির্বাণ লাভ করলেন। প্রধান থের মহাকাশ্যপ বুঝলেন, সঙ্ঘকে বাঁচাতে হলে তার ভিত আরও পোক্ত করা দরকার। সব মুশকিল আসানের জন্যে আর তো তথাগতকে পাওয়া যাবে না। ঠিক হলো, রাজগৃহে থের ভিক্ষুদের একটা সঙ্গীতি (= সম্মেলন) বসবে। ধর্ম আর বিনয় (= সঙ্ঘ-র নিয়মনীতি)-এর সব কথা পাকা করে ফেলতে হবে। তার জন্যে মহাকাশ্যপ চারশ নিরানব্বই জন অর্হৎ (= এই জীবনেই যাঁরা নির্বাণলাভ করেছেন, অপ্রমত্ত চিত্তে একা যাঁরা বিচরণ করতে পারেন) বাছাই করলেন। তাঁরাই বললেন, যদিও আনন্দ-র শিক্ষা এখনও শেষ হয় নি, তবু তাঁকেও এই সঙ্গীতিতে ডাকা হোক।

মহাকাশ্যপও রাজি হলেন।

রাজগৃহে শুরু হলো প্রথম সঙ্গীতি। গোড়ায় উপালি বললেন বিনয়-এর সব নিয়মনীতি। তারপর আনন্দ-র পালা। তাঁকে বলতে হলো, কখন কোথায় কোন্ উপলক্ষ্যে বুদ্ধ কোন্ সূত্র-উপদেশ দিয়েছিলেন। সব প্রশ্ন-উত্তরের শেষে আনন্দ জানালেন, নির্বাণলাভের আগে ভগবান্ বুদ্ধ আমায় বলেছিলেন, আমার (বুদ্ধের) মৃত্যুর পরে সঙ্ঘ ইচ্ছে করলে ছোটোখাটো শিক্ষাপদ (= নিয়ম) গুলো তুলে দিতে পারে।

ভিক্ষুরা জানতে চাইলেন, আনন্দ, তুমি কি ভগবান্‌কে জিগেস করেছিলেন, ছোটোখাটো শিক্ষাপদ কোন্‌গুলো?

— না, আমি তা জিগেস করি নি।

দেখা গেল, কেউই ঠিক করতে পারছেন না, শিক্ষাপদগুলো কী কী। শেষে মহাকাশ্যপ বললেন, তাহলে আর এ নিয়ে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। যেমন আছে, তেমনি থাকুক।

এর পরেই সঙ্গীতির চেহারাটা হঠাৎ কেমন পাল্‌টে গেল। সবাই মিলে খামোখা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আনন্দ-র ওপর।

—আনন্দ, তুমি অপকর্ম করেছ। এটা তোমার জিগেস করা উচিত ছিল। স্বীকার করো, তুমি অপকর্ম করেছ।

'অপকর্ম' (পালিতে বলে দুক্কট = দুষ্কৃত) মানে ভিক্ষুর পক্ষে এক ধরণের পাপ, স্বীকার করে ক্ষালন করতে হয়।

আনন্দ শান্তভাবে বললেন :

— ভুলে গিয়েছিলুম (বা, আনমনা ছিলুম) বলে সেকথা আমি জিগেস করি নি। আমি তো এর মধ্যে কোনো অপকর্ম দেখছি না। তবে আপনাদের ওপর শ্রদ্ধা (= বিশ্বাস) আছে বলে এটাকে অপকর্ম বলছি।

থের ভিক্ষুরা কিন্তু অত সহজে আনন্দকে রেহাই দিলেন না। শুরু হলো অভিযোগের শিলাবৃষ্টি :

— আনন্দ, ভগবানের বর্ষাকালে পরার কাপড়টি পা দিয়ে মাড়ানোর পর তুমি সেলাই করেছিলে। বলো, এটা অপকর্ম হয়েছিল...

—আনন্দ, ভগবানের শরীর (মৃতদেহ) বন্দনা করার সুযোগ মেয়েদের তুমি আগে দিয়েছিলে। তাদের চোখের জলে ভগবানের দেহ সিক্ত হয়েছিল। বলো, এটা অপকর্ম হয়েছিল...

—আনন্দ, তুমিই মেয়েদের প্রব্রজ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলে। বলো, এটা অপকর্ম হয়েছিল...

—আনন্দ, তুমি যদি বলতে তবে ভগবান্ আরও কিছুদিন বাঁচতে রাজি হতেন। কিন্তু তুমি বল নি। বলো, এটা অপকর্ম হয়েছিল...

আশ্চর্য! যে ভিক্ষুরা চেয়েছিলেন অর্হৎ না হলেও আনন্দ সঙ্গীতিতে আসুন, তাঁরাই এখন আনন্দকে পেড়ে ফেলতে চাইছেন! মহাকাশ্যপ নিজেই ছিলেন আনন্দ-র খুব বন্ধু। তিনিও চুপ। একজনও উঠে দাঁড়িয়ে একবার বললেন না—এটা কী হচ্ছে? আমরা তো সবাই জানি, আনন্দ কোনোদিন ছন্দ (= উত্তেজনা) দোষ মোহ-র পথে পা দেন নি, তবু তাঁকে এইভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে কেন?

আনন্দ কিন্তু নির্বিকার। প্রতিটি অভিযোগের উত্তরে তিনি তাঁর বক্তব্য জানালেন, ভুল হয়ে থাকলে স্বীকার করলেন, কিন্তু প্রতিবারেই শেষে একই কথা বললেন:

—আমি তো এর মধ্যে কোনো অপকর্ম দেখছি না। তবে আপনাদের ওপর শ্রদ্ধা (= বিশ্বাস) আছে বলে এটাকে অপকর্ম বলছি। (*বিনয়পিটক, চুল্লবগ্গ* 11)

একেবারে একলা— তবু কিসের জোরে আনন্দ মেন অচল অটল থাকতে পারলেন? নিজের কাজকে তিনি কিছুতেই ভুল বলে মানবেন না—চারশ নিরানব্বই জন বললেও না। আবার সঙ্ঘ-র শৃঙ্খলাও তিনি ভাঙবেন না। চারশ নিরানব্বই জন অর্হৎ যখন বলছেন, এগুলো অপকর্ম — ঠিক আছে, আপাতত অভিযোগ মেনে নিলুম। কিন্তু নিজের ধারণা ভুল—এমন কথা কিছুতেই মানব না। — তার জন্যে তিনি বুদ্ধের দোহাইও পাড়েন না। নিজের মতটাই বলেন। দৃঢ়ভাবে সবিনয়ে।

কিসের শক্তিতে আনন্দ এমন করতে পারেন?

কারণ, আনন্দ জানতেন, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সত্যের ওপর। সে সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছেন হৃদয়-মন-মনীষা দিয়ে। তার থেকেই এসেছিল এই দুর্লভ আত্মবিশ্বাস। সমর্থন করার মতো একজনও নেই—তাতে কী আসে যায়? তাঁর বিবেক তো সদ্যফোটা ফুলের মতোই অমল, মনের অগোচরেও কোনো পাপ নেই, যা করেছেন তার জন্যে অন্তরে নেই অণুমাত্র গ্লানি। যেখানে তিনি কিছু করতে বা জানতে ভুলে গেছেন — তা স্বীকার করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই। কিন্তু যেখানে কোনো অন্যায় হয় নি বলে মনে করেন — সেখানে তিনি পাহাড়ের মতোই অনড়।

কেন মেয়েরা বুদ্ধের শরীর আগে বন্দনা করবেন না? তাঁদের যদি আগে তা করতে দেওয়া না হতো, তবে পরে সমস্যা দেখা দিত।

কেন মেয়েরা ভিক্ষুণী হতে পারবেন না? বুদ্ধকে যাঁরা মানুষ করেছিলেন, তাঁর সেই মাসি, ধাই-মা— কেন তাঁরা বঞ্চিত হবেন এই অধিকার থেকে?

আনন্দ তাই এর কোনোটিকেই অপকর্ম বলে মানবেন না। সঙ্ঘ-র স্বার্থে বহু-র মত মানতেই হয়, কিন্তু উচিত তো আর তাই বলে অনুচিত হয়ে যায় না। অন্যায় অভিযোগ তো ন্যায্য প্রমাণ হয় না। সে বিচার হয় মহাকালের দরবারে। সংখ্যায় নয়, নীতির নিরিখে।

প্রথম সঙ্গীতির প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে, অনেক উত্থান-পতন পেরিয়ে এসে আমরা তো আজ বুঝি : আনন্দ সত্যিই কোনো অপকর্ম করেন নি। দু-একটা ব্যাপারে তাঁর হয়তো ত্রুটি ছিল, কিন্তু সেগুলো অপকর্মর পর্যায়ে পড়ে না।

বরং যে মহামান্য অর্হৎরা সবাই মিলে আনন্দকে দিয়ে অপকর্ম কবুল করিয়েছিলেন, তাঁরাই আমাদের চোখে ছোটো হয়ে যান।

আনন্দও নিশ্চয়ই জানতেন, বহু-র মতকে আপাতত মেনে না নিলে সঙ্ঘ টিকবে না। তিনি এও জানতেন, এই যে বারবার বলছেন—'আমি তো এর মধ্যে কোনো অপকর্ম দেখছি না', সেই মুহূর্তে কেউ সে কথায় কান দেবে না। তবু তাঁর মনে হয়েছিল, কথাটা বলা দরকার। চারশ নিরানব্বই জনের চাপে পড়ে ঠিক কাজকে ভুল বলাটা উচিত হবে না। সত্য জেনেও কেন তা গোপন করবেন?

এমনই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

জীবনে মাঝে মাঝে এমন পরিস্থিতি আসে, যখন আনন্দ-র মতোই কেউ কেউ একা পড়ে যায়। পাশে দাঁড়ানোর মতো একজনও থাকে না। সবাই ঘিরে ধরে, জোর করে কবুল করাতে চায়: বলো তুমি অপকর্ম করেছ...

অবস্থা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সঙ্ঘ-র শৃঙ্খলা ও নিয়ম মানার প্রশ্ন। তখন?

পথ দেখালেন আনন্দ।

অনু গল্প

পারমিতা

সুমনার ও ইচ্ছে ছিল ছোট্ট সংসার সাজানো গোছানো। কখনও হাসির রোল কখনও ভীষণ অভিমান। সমস্তটাই বুঝবে বাড়ির লোকজন। বিশেষত কাছের লোকজন। হঠাৎই একটা শব্দ 'অসহ্য' বলতে বলতে সুমনার সব হারিয়ে গেল। মনতো নেই-ই মনের মানুষটাও নেই—আমি শুধু তার কাছে অসহ্য।

* * * *

রথীন্দ্রনাথের ছোটোবেলার বন্ধু অসীমবাবু। বন্ধুত্ব বেশ অটুট, ষাটের পরেও দুজনের কথা হয়। দেখা হয়। রথীর বয়সে রথী একটু বেশী বুড়ো বুড়ো। অসীম বেশ Handsome, পরিবার থেকে অফিস সবই ওদের গল্পের মধ্যে আসে আবার যায়। এতদিন হল অসীম রথী কেউ কারুর বাড়ি যায়নি কিন্তু এক পাড়ার দৌলতে অনেক কাজই একসাথে করে। সেদিন প্রথম অসীম এল রথীর বাড়ি। বৌদি, ছেলে মেয়ের সঙ্গে দেখা, কথা, চা খাওয়া তার পর চলে গেল। এরই মাঝে আসীম আর বৌদি মাধবীর চোখ চাওয়া থেকে - সব অন্যরকম, দুটো পরিবার মিলিয়ে গেল বন্ধুত্বের জেরে, তবে রথী অসীমের নয় অসীম আর মাধবীর।

* * * *

আজ ক্যালেন্ডারের লাল তারিখ। সকাল থেকেই খোকার ব্যস্ততা আজকে ট্রেনে ভিড় বেশি, অথবা এখানে ওখানে সবার মাঝে বিক্রি হবে অনেক প্যাকেট বাদাম। খোকার বাদাম জোগায় মহেশবাবু। রোজ ৫০ টাকার কিনলে বিক্রিই হতে চায় না কিন্তু আজ একবেলার ২০০ টাকার বিক্রি। আজ খোকা মাংস কিনবে। বাব, মা, দাদা সব্বাইকে দেবে। তবে লাল তারিখের পরের দিন সেটা। ছুটি ছিল বলে কাল।

* * * *

দিদিভাই প্রতিবার তুমি শাড়ির রঙ নিয়ে এত ভাবো কেন বলতো। তুমি তো বেশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা তোমাকে মানায় না এমন রঙ কোথায়? বলে নিচের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তনিমা। আর রুবি একটা শাড়ি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, চোখ দিয়ে জল টপ টপ ঝরে পড়ছে, মনটা মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেছে ৯ বছর, মনে পড়ল সৌরভের কথা - ভীষণ সুন্দর একটা জাম রঙের শাড়ি, প্রথম প্রেমের প্রথম পুজোয় দিয়েছিল কিন্তু সেই শাড়ি, সেই জাম রং সমস্তই উলটপালট করে দিয়েছিল রুবির জীবনকে। এখন শুধু রুবি বিশ্বাস বাড়ির বউ বৌ। এক নিয়মনিষ্ঠাবর্তী, গৃহ কর্মে নিপুনা বড় বৌ - কোথায় প্রেম। কোথায় মিলন।

পাহাড়তলি...শহরতলি

দেবযানী ভট্টাচার্য

পায়ের তলায় কিলো খানেক সর্ষে অথচ বেড়ী দিয়ে বাঁধা পা দুখানি! এটাই বোধকরি বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর চোরা আক্ষেপ। বেড়াবার সাধ গোটা শরীর জুড়ে অথচ সাধ্য সিধা উল্টো রাস্তায় দৌড় দেয়। তাই আনন্দবাজারের পাতায় ঘোরাঘুরির লেখাজোখাগুলো দুচোখে জড়িয়ে মানসভ্রমনেই তৃষ্ণা মেটায়। কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যেও তো শিকে ছেঁড়ে কখনো সখনো। এবার পুজোর পরপর একটা সুযোগ এসে গেল বঙ্গভূমের তরাই অঞ্চলের ঝাঁকি দর্শনের। আমি কিন্তু মন্দার বোসের মতোই গ্লোবট্রটার, অপুর মতোই হাঁ করা, বিস্মিত হতেই জন্মেছি!

সুনতালেখোলা নামটা যতবার মনেমনে আওড়ালাম, অদ্ভুত এক রিনরিনে মিঠে বোল বাজলো! শিয়ালদা থেকে রাতে কাঞ্চণকন্যাতে সওয়ার...পরদিন সকালে ট্রেন শিলিগুড়ি পেরোনোর পর থেকেই প্রকৃতি নিজের সাজগোজ পাল্টাতে শুরু করলো। সবুজের রাজত্ব আর ময়ূরকণ্ঠী পাহাড়ের উদ্ভাস। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো খানিকটা আগে। এখন রোদ ঝলমল। তাই অভাবনীয়ভাবে ময়ূরের ঝাঁক দেখতে পেলাম ট্রেন থেকেই! দিবারাত্র কাকের দঙ্গল দেখা শহরতলীর চোখে তখন বেবাক বিস্ময়। এরপর ট্রেন চলছে, চা বাগান...জঙ্গল দূরে পাহাড়...তিস্তা...আরো নাম না জানা কত ছোটো ছোটো নদী...ছবির মতো গ্রাম...ঝমঝমে ব্রীজ...রঙচঙে—ষ্টেশান... এসে গেলাম নিউ মাল জংশন। নেমেই দেখি টুকটুকে লাল মারুতি অল্টো নিয়ে হাজির প্রাক্তন ভারতীয় সেনানী সন্তোষজী, আমাদের সারথী। মালবাজারে ভয়ংকর ঝাল কিন্তু

দারুন সুস্বাদু মোমো দিয়ে পেটপুজো সেরে আবার পথচলা শুরু। গন্তব্য সুনতালেখোলা। নেপালী ভাষায় সুনতালে অর্থ কমলালেবু।

পাহাড়ী পাকদন্ডী, ডাইনে বাঁয়ে জঙ্গলে-পাহাড়, ছোটোবড়ো নদী, ঝর্না, ঝোরা এরই মধ্যেদিয়ে গড়িয়ে চলল গাড়ী। পৌঁছে গেলাম আরণ্যক প্রকৃতির একেবারে কোলের মধ্যে কমলালেবুর রাজত্বে। এখানে একটা কথা বলে নিই, সবুজ পাহাড় কথাটা আসলে কতটা ব্যঞ্জনাময় তা ডুয়ার্সে না এলে বোধকরি জানা যায় না। স্টেশন থেকে সুনতালেখোলা, মাঝের পথটি এককথায় ছোট্ট বাচ্চার ড্রয়িং খাতার একখানি পাতা। চোখে পড়লো—খুনিয়া, চালসা, মেটালি আরো কি কি নাম না-জানা গ্রাম। আর নিষ্পাপ চেহারার অপাপবিদ্ধ হাসি নিয়ে নেপালী, লেপচা, ভুটিয়া মানুষজন।

সুনতালেখোলা জায়গাটির সৌন্দর্য্য যদি একটি শব্দবন্ধে প্রকাশ করতে হয়, তো তা আমার কাছে 'শব্দময় নৈঃশব্দ্য'। আরণ্যক প্রকৃতি যেন একেবারে নিজস্ব ঘরানার বাচিক শিল্পী এখানে। পাহাড়ী নদী-ঝোরার উচ্ছসিত তান-বোল-তান, পাখপাখালির সকালবেলার রেওয়াজ, নাম না জানা কতো সব পতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনিক্ষেপন, মন্দ্র-মধ্য-তান মিলিয়ে আশ্চর্য্য এক কনসার্ট। বন উন্নয়ন দপ্তরের কর্মীরা সুন্দর কটেজ, নদীর পাশে তাঁবু সাজিয়ে রেখেছেন আমাদের মতো সবুজের অভিসারী শহর পালানো মানুষদের জন্য। এদের আতিথেয়তা, আন্তরিকতা সত্যিই মনকে আপ্লুত করে। সুনতালেখোলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যেমন ভুলে যাওয়া অসম্ভব তেমনি তার—কোলের সহজ সুন্দর মানুষগুলিকে ভোলাও ততটাই অসম্ভব। এক-দেড়দিনের বিনিসুতোর আত্মীয়তা পাথেয় হয়ে রইল জীবনভর।

এরপরের গন্তব্য পারেন। আরেকটি ছোট্ট তরাই জনপদ। পথে দেখে নেওয়া গেলো জলঢাকা নদীর সাবলীল সুন্দরতা, ভারত-ভুটান সীমান্ত, বিন্দু, আরো বেশকিছু এধার ওধারের আশ্চর্য্য সুন্দর পাহাড়ী বৈচিত্র। শান্ত সমাহিত মেঘ পাহাড়ের কোলে কেটে গেলো দুটি দিন। পাহাড়ী বনপথে হাঁটতে হাঁটতে দুচোখে মেখে নিলাম অপার্থিব সবুজের ক্যানভাসে রোদ ঝলমল অনবদ্য দৃশ্যগুলিকে। সঞ্চিত করে নিলাম শহুরে দিন যাপনের জীয়ন রসদ। ফিরে এলাম মূর্তির নদী জঙ্গল পেরিয়ে আবার সেই নিউ মাল জংশন। এবার ফেরার ট্রেন। নাগরিক জীবনের থোড়-বড়ি-খাড়ার রোজনামচা। তরাই প্রকৃতি যেন মায়ার ঘন নীলচে-সবুজ কাজল চোখে চেয়ে বলল, 'জীবনধারনের ক্লান্তি যখন ঢেকে ফেলবে মনের আকাশ, তখন আবার এসো। আমি তোমার ভিতরমহল ভরিয়ে দেব নতুন করে বাঁচার সঞ্জীবনীতে।'

মরুভূমির রাজ্যে

শর্মিষ্ঠা দাস

'রাজস্থান' নামটাতেই বেশ একটা রাজা রাজা বা রাজসিকতার রেশ পাওয়া যায়। আক্ষরিক অর্থে রাজস্থান হল রাজকীয় বা রাজার স্থান। এছাড়া সত্যজিৎ রায় তাঁর বিখ্যাত 'সোনার কেল্লা' ছবির মাধ্যমে রাজস্থানকে আপামর বাঙালীর কাছে একটা বিশেষ পর্যটনকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত দিয়েছেন। থাক সে সব কথা, অনেকদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা এবছর পূজোর সময় বেড়িয়ে পড়লাম রাজস্থানের উদ্দেশে। মহাসপ্তমীর দিন সকালে শুরু হল আমাদের রাজস্থান ভ্রমণ। প্রথমে গেলাম জয়পুর। জয়পুর হলো রাজস্থানের বর্তমান রাজধানী। আগে রাজস্থান মূলত কয়েকটি ভাগে ভাগ ছিল। মেবার, মারবার, জয়সলমীর, বিকানীর, অম্বর, কোটা ও বুন্দি। আমরা যাব অম্বর বা জয়পুর, মেবার বা উদয়পুর ও চিতোর, মারবার বা যোধপুর এবং জয়সলমীর। জয়পুরে প্রথমদিন আমরা গেলাম দূর্গ দেখতে। প্রথমে আমরা গেলাম আমের ফোর্ট বা অম্বর ফোর্ট। এই ফোর্টগুলি তৈরি হয়েছিল কয়েকশো বছর আগে। এর বিশালত্ব আমাদের অবাক করে। ফোর্টের মধ্যেই যেন আস্ত একটা শহর।

এরপর আমরা গেলাম জয়গড়। রাস্তায় পড়ল ময়ূর। চিড়িয়াখানার বাইরে, এতো সামনে থেকে ময়ূর দেখা এই প্রথম। এই পাখীর রূপও যেন রাজসিক। এরপর সেই বিখ্যাত নাহাড়গড়। যেখানে মুকুলের 'দুষ্টু লোক' ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিল। এই সব ফোর্টগুলোর স্থাপত্য দেখলে অবাক হতে হয় যে এতো বছর আগেও আমাদের দেশের স্থাপত্য-শিল্প কতো উন্নত ছিল। আজকের স্থপতিরা যা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সাহায্যে চিন্তা করছে, সেই সময়ের স্থপতিরা শুধু হাতেই তা কতো সহজে করে দেখিয়েছে। প্রত্যেকটি দূর্গই

হাওয়া মহল

যথেষ্ট আলো বাতাসে পূর্ণ। আর ভেতরে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দেখার মতো। জয়পুরের দ্বিতীয়দিন আমরা গেলাম বিড়লা মন্দির, অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, হাওয়া মহল, সিটি প্যালেস ও সোওয়াই জয় সিংহের তৈরী যন্তরমন্তর। তখনকারদিনে জ্যোতির্বিদ্যায় ভারত যে কতটা উন্নত ছিল তা এই বিশাল যন্তরমন্তরে গেলে বোঝা যায়।

এইভাবেই আমাদের জয়পুর ঘোরা শেষ করে, রাতের ট্রেন ধরে চললাম সোনার কেল্লার দেশে জয়শালমীর। ট্রেন চলল সেই পরিচিত বারমের, রামদেওড়া, পোখরান স্টেশনের উপর দিয়ে। পথে পড়ল প্রচুর ফণী মনসার গাছ। মান্দার বোসের সেই শনি মনসা গাছ, যাতে নাকি শনিবার শনিবার ফুল ফোটে। অবশেষে দুপুরবেলা আমরা পৌঁছালাম জয়শালমীর। হোটেলে পৌঁছে দুপুরের খাওয়া খেয়ে আমরা চললাম মরুভূমি দেখতে শহর থেকে ৪২ কিমি. দূরে 'স্যাম' মরুভূমিতে। সেখানে যাবার আগে আমরা গেলাম একটা জৈন মন্দির দেখতে। সারা রাজস্থানে জৈন ধর্মের লোকদের খুব প্রভাব, তাই সারা রাজস্থানেই প্রচুর জৈন মন্দির দেখা যায়। শেষে সূর্যাস্তের কিছু আগে আমরা পৌঁছালাম বালির দেশে।

মরুভূমিতে সূর্যাস্ত

গাড়ী ছেড়ে এবার আমরা চড়ে বসলাম উটে। তাতে চড়েই আমরা যাবো বালির দেশে। উটে চড়ে আমদের অবস্থা হলো অনেকটা লালমোহন বাবুর মতো। চড়া রোদ আর উটের পিঠ থেকে পড়ে যাবার ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। আমাদেরও মনে হল, 'একটু জল নয় দরকার একটা আস্ত কুঁজোর'। এভাবেই উটের পিঠে নাচতে নাচতে আমরা এসে পৌঁছালাম বালির সাম্রাজ্য 'স্যাম-ডিউনস'-এ। চারিদিকে খালি বালির পাহাড়, তাতে অস্তমিত সূর্যের আলো পড়ে এক মায়াবী মুহূর্ত তৈরী করেছিল। খারাপ লাগল এইরকম একটা সুন্দর জায়গাও প্লাস্টিকের দৌরাত্ম্য থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি বা আমরা বাঁচতে দিইনি। যাক সে কথা, ডিউনস থেকে বেড়িয়ে আমরা চললাম সেদিনের রাত্রিবাসের জায়গায়। মরুভূমির একপাশে তাঁবুতে আমরা থাকব। স্যাম মরুভূমিতে এইরকম অনেকগুলি থাকার জায়গা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা বিভিন্ন লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। আমরাও সেখানে তাদের সাথে সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম। অনুষ্ঠান শেষে সেখানে রাজস্থানী খাবার পরিবেশন হলো। সাংগ্রি-কা-শাখ, বাজরা রোটি, ডাল-বাটি-চুমরা, আর চাউল। রাত যত বাড়ছে ঠান্ডাও তত বাড়ছে। প্রকৃতির কি অদ্ভুদ খেয়াল, দুপুরের আবহাওয়ার সঙ্গে রাতের আবহাওয়ার কোন মিল নেই। দুপুরে রোদের তাপে যেমন চাঁদি ফাটা অবস্থা, রাত্রে সেখানেই দুটো মোটা কম্বল গায়ে শুয়ে আছি। রাজস্থানে সবজায়গায় অক্টোবরে সূর্যোদয় হয় সকাল ৭টা আর সূর্যাস্ত হয় সন্ধ্যা ৬-৩০টায়। তাপমাত্রা দিনে ৩০ সেন্টিগ্রেড আর রাতে ২০ সেন্টিগ্রেড। পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফার্স্ট করে ফিরে চললাম জয়শালমীরে। প্রথমে গেলাম গাদিসার লেক দেখতে। এই লেকের ব্যাপারে কথিত আছে যে পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণ তার বংশধরদের থাকার উপযুক্ত জায়গা হিসাবে মরুভূমির মধ্যে একটি জায়গা পছন্দ করেন এবং খাবার জলের জন্য এই লেক তৈরী করেন। তবে এই লেকের জলই আগে এখানকার লোকেরা খাবার জলের জন্য ব্যবহার করত। লেক দেখে আমরা চললাম মুকুলের স্বপ্নের 'সোনার কেল্লা' দেখতে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরী এই কেল্লা কোন সিমেন্ট বা চুন সুরকির গাঁথনি দিয়ে নয়। পাথরের ওপর খাঁজ কেটে আর একটা পাথরকে সেই খাঁজের উপর বসিয়ে পাথরের সঙ্গে পাথরের লকিং সিস্টেম করে তৈরী হয়েছিল এই কেল্লা। এর মধ্যেও একটা জৈন মন্দির আছে। কেল্লার ভেতর এখন প্রায় তিন হাজার লোক থাকে। কেল্লার অপূর্ব কারুকার্য দেখার পর আমরা গেলাম 'নাথওয়াল কী হাভেলী' দেখতে। এই হাভেলী

সোনার কেল্লা

ছিল জয়শালমীরের দেওয়ানদের হাভেলী। এই হাভেলীর বিশেষত্ব হলো এর সামনের দুটি ভাগ দুই রকমের। কারণ দুই ভাই আলাদা ভাবে এই হাভেলী তৈরী করেছিল। এরপর আমরা গেলাম 'পাটোয়ার কী হাভেলী' দেখতে। এই হাভেলী পাঁচটি আলাদা আলাদা হাভেলী দিয়ে তৈরী। অপূর্ব সুন্দর এর জাফরির কাজ। পাথর কেটে কেটে যে কি সুন্দর জাফরি করা যায় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। হাভেলী দেখা শেষ করে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকালে আবার বেড়িয়ে পড়লাম শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে খুরি গ্রাম ও মরুভূমি দেখতে। স্যামের মতো খুরিতে ভীড় না থাকলেও লোক সমাগম ভালোই ছিল। সেই রাত্রে আমরা জয়শালমীরের হোটেলে কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা ছটায় যোধপুর যাবার বাস ধরে চললাম যোধপুরের দিকে। খুব ভালো রাস্তা, ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় মসৃণ রাস্তায় যেতে বেশ ভালোই লাগছিল। মনে মনে চিন্তা করছিলাম এই পথেই তো মন্দার বোসকে ধরতে ফেলুদা অ্যান্ড কোং গিয়েছিল। বেলা দশটায় আমরা পৌঁছালাম যোধপুরে। বেশ সাজানো শহর এই যোধপুর। শহরের অনেক দূর থেকেই মেহেরানগড় ফোর্ট দেখা যায়। যোধপুরে পৌঁছে সেই দিনটা আমরা সারাদিন প্রায় বিশ্রাম নিলাম। সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে আমরা শহরের বাজার ঘুরতে গেলাম। পরদিন সাড়ে নটায় বের হলাম যোধপুর ঘুরতে। যোধপুর মূলত তৈরী করেছিলেন যশবন্ত সিং। প্রথমে গেলাম সিটি প্যালেস দেখতে। এই প্যালেস এখন তিনটি ভাগে ভাগ করা আছে। এক ভাগে রাজপরিবারের লোকজন থাকে। দ্বিতীয় ভাগ মিউজিয়াম, তৃতীয় ভাগ হোটেল। মিউজিয়াম ঘুরে আমরা গেলাম সার্কিট হাউস হয়ে মোহরানগড় ফোর্ট দেখতে। একমাত্র অজেয় ফোর্ট, যা কোনদিন শত্রুরা জয় করতে পারেনি। টিকিট কেটে লিফটে করে আমরা দুর্গের একদম ওপরে চলে গেলাম। জয়পুর যেমন Pink City, যোধপুর তেমনি Blue City নামে পরিচিত। এখানে ব্রাহ্মণরা বাড়ী ঠান্ডা রাখার জন্য বাড়ীতে নীল রং করত। সেটা আজও চালু আছে। মেহেরানগড় ফোর্টের ভিতরের সজ্জা খুবই সুন্দর। অবাক হয়ে দেখতে হয় রাজাদের বৈভব। এরপর আমরা গেলাম যশবন্ত থাডা দেখতে। সেখান থেকে মেবারবাগ হয়ে সন্ধ্যাবেলা হোটেলে ফিরে আসলাম।

পরদিন আমাদের গন্তব্য হলো রাজস্থানের এক মাত্র শৈল্যশহর মাউন্ট আবু। আরাবল্লী পর্বতের একটা চূড়া আবু। গাড়িতে যোধপুর থেকে মাউন্ট আবু যেতে সময় লাগে পাঁচ ঘন্টা। পথে পড়ল সিড়হী। সিড়হী হলো জৈনদের বিখ্যাত ধর্ম স্থান। সিড়হীতে আমরা রাজস্থানে মুকুলের সেই বিখ্যাত মোটা মোটা রুটি আর ঘি দিয়ে দুপুরের খাবার সারলাম। এক একটা রুটির সাইজ আমাদের ভাত খাওয়া থালার মতন। এরপর আমাদের গাড়ি চলল মাউন্ট আবুর দিকে। মাউন্ট আবু যেতে হলে প্রথমে যেতে হবে আবু রোডে। আবু রোড থেকে ২৯ কিমি চড়াই ভেঙ্গে মাউন্ট আবু পৌঁছলাম বিকেল ৪টায়। প্রথমে আমরা গেলাম সান সেট পয়েন্ট-এ। কিছুটা গাড়িতে গিয়ে তারপর হেঁটে বা ঘোড়ায় ছোট ছোট চৌকো বাক্সের মত চাকা লাগানো গাড়ি যা মানুষের সাহায্যে ঠেলে সান সেট পয়েন্ট-এ নিয়ে যায়। সান সেট পয়েন্ট-এ গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। তিল ধারনের জায়গা নেই। কোনভাবে একটু ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসে পড়লাম। তবে মেঘলা থাকার জন্য ভালো ভাবে সান সেট দেখা গেল না। সেখান থেকে ফিরে আমরা গেলাম নাক্কি লেকে। পুরাণে আছে শিব তাঁর নখ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে এই লেক তৈরি করেছিলেন, তাই এই লেকের নাম নাক্কি লেক। এখানকার পাহাড়গুলি খুবই অদ্ভুত, দেখলে মনে হয় যেন কেউ

মাউন্ট আবুর পাহাড়ের গায়ে গর্ত

নখ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে দিয়েছে। সেইদিন আর কোথাও না গিয়ে আমরা খেয়ে দেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন গেলাম আবুর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গুরুশিখরে। সেখান থেকে ফেরার পথে প্রজাপতি ব্রহ্মকুমারী উদ্যান, অচলগড় হয়ে বিখ্যাত দিলওয়ারা মন্দিরে। জৈন্যদের একটি বিখ্যাত ধর্মস্থান। ভীষণ সুন্দর এর স্থাপত্য। পাহাড় কেটে কেটে কি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই মন্দির বানানো হয়েছিল তা না দেখলে হয় না। মন্দিরের গায়ের তৈরি প্রত্যেকটি মূর্তি এতো সূক্ষ অথচ প্রকট তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। প্রখর রোদেও সাদা পাথরের তৈরি মন্দির প্রাঙ্গণ খুবই ঠান্ডা, তবে গাইডরা খুব তাড়া লাগায় এই মন্দির দেখতে। তাদের সাথে দেখলে মন্দির দেখা হয়, অনুভব হয় না। সেখান থেকে ফিরে দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা চললাম নাক্কি লেকে নৌকা বিহারে।

পরদিন মাউন্ট আবুকে বিদায় জানিয়ে চললাম ১৮৫ কিমি. দূরে উদয়পুরের পথে। সময় লাগবে ৫ ঘণ্টা। সোনালী চতুর্ভূজ প্রকল্পের রাস্তা সারা রাজস্থান জুড়েই রয়েছে। আমরা ঠিক করলাম আবু থেকে রণকপুর, হলদিঘাট হয়ে উদয়পুর যাব। রণকপুর খুব সুন্দর জায়গা। তবে সাধারণ বাঙালী পর্যটক রণকপুর খুব একটা যায় না। সবুজ পাহাড়ে ঘেরা। মরুভূমির বুকে একটা মরুদ্যান। রণকপুরে মন্দিরটি হলো দিলওয়ারা মন্দিরের মতো। তবে দর্শনগত দিক দিয়ে রণকপুর অনেকবেশি দৃষ্টিনন্দন ও অনেক বড়।

রণকপুরের মন্দির

পরিবেশ, আকার, দর্শন সব মিলিয়ে রণকপুরের মন্দির আমাদের দিলওয়ারা থেকেও বেশি ভালো লাগল। ফেরার পথে একটা ধাবায় আমাদের দুপুরের খাবার খেয়ে চললাম রানা প্রতাপের চিতোরগড় দেখতে, সেখানে রানা প্রতাপ সর্বস্ব বাজী রেখে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে মুঘলদের কাছ থেকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। সেখানে তাঁর যোগ্য সহযোগী ছিল তার প্রিয় ঘোড়া চেতক। উদয়পুর ও চিতোরে রাণাপ্রতাপ ও চেতককে সকাল ভগবানের মতো শ্রদ্ধা করে। হলদিঘাট পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। সেখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সন্ধ্যা ৭টা - ৭.৩০ সময় আমরা উদয়পুর শহরে পৌঁছলাম। সেখানে পৌছে আমরা গেলাম পিছলা লেকে সিটি প্যালেস দেখতে। রাতের বেলায় আলো ঝলমলে সিটি প্যালেস দেখতে অসাধারণ। পরদিন সকালবেলা বেরিয়ে প্রথমে গেলাম সিটি প্যালেস দেখতে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই প্যালেস তৈরী করেছিল রাণা উদয় সিং। বলা হয় এক সাধুর নির্দেশে চিতোর থেকে রাজধানী সরিয়ে রাণা উদয় সিং চিতোর থেকে কিছু দূরে উদয়পুরে এই নতুন রাজধানী তৈরী করেন। রাজস্থানের অন্যান্য প্রাসাদ বা দূর্গের মতো জৌলুস এই দূর্গের নেই বটে তবে গুরুত্বের দিক থেকে এই দূর্গ অসাধারণ। রাজস্থানের এই সব দূর্গ বা প্রাসাদ দেখতে দেখতে আমাদের মনে একটা প্রশ্ন জেগেছিল যে সব দূর্গের যাতায়াতের রাস্তাগুলি সরু সরু ও এত ছোট যে একসঙ্গে দুজনের বেশী সেখানে যেতে পারে না। গাইড বলল এটা নিরাপত্তার জন্য। যাতে শত্রু আক্রমণ করলেও যতটা সম্ভব প্রতিরোধ করা যায়। এখানকার ময়ূর মহলে এতো সুন্দর মিনের কাজ, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এখানে মেবারের রাণাদের আরাধ্য দেবতা সূর্যদেবের বিশাল এক

সিটি প্যালেস

মূর্তি আছে। এখান থেকে পিছোলা লেকে জগৎ মন্দির ও লেক প্যালেস দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় দু ঘন্টা সময় সিটি প্যালেসে কাটিয়ে আমরা গেলাম পিছোলা লেকে বোডিং করতে। নৌকা চড়ে আধঘন্টা ধরে আমরা পুরো লেকে ঘুরলাম। উদয়পুরকে বলা হয় লেক সিটি। এখান থেকে আমরা গেলাম ফতে সাগর লেক দেখতে। সেখানে রাণা প্রতাপ মিউজিয়াম থেকে গেলাম সহেলি ও কি বাড়ী

দেখতে। এরপরে আমরা বিশাল এক দূর্ভাবনায় পড়েছিলাম, সমস্যাটা হলো পরেরদিন আমাদের সন্ধ্যাবেলায় কলকাতায় ফিরতে হবে। আগে আমাদের প্ল্যান ছিল উদয়পুর ঘুরে আমরা জয়পুর ফিরে যাব। ঘুরতে ঘুরতে ঠিক হলো জয়পুর নয় চিতোরে থাকব। কিন্তু ঘুরতে ঘুরতে রাজস্থানে সব দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে আমাদের ঘোরার নেশায় পেয়ে গেছে। আর তাতে আরও ইন্ধন জোগালো আমাদের হোটেলের মালিক, তিনি বললেন তোমরা চিতোরে না থেকে পুস্কর চলে যাও। তাতে বেশ কিছুটা জয়পুরের দিকে এগিয়ে থাকা যাবে। কারণ চিতোর থেকে জয়পুর ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা, সেখানে পুস্কর থেকে ২.৩০ থেকে ৩ ঘণ্টা। এছাড়াও আরো দুটো জায়গা দেখা হয়ে যাবে। হয়তো পুস্কর পৌছাতে আমাদের রাত হবে কিন্তু পরদিন সারাক্ষণ দুর্ভাবনায় থাকার থেকে একদিন না হয় বেশি রাস্তা চললাম।

সেইমতো দুপুর ২টোতে আমরা উদয়পুরকে বিদায় জানিয়ে দৌড়লাম চিতোরের দিকে। 'চিতোর' রানী পদ্মিনীর চিতোর, মীরাবাই-এর চিতোর। শতকের পর শতক ধরে যা মনে করায় রাজপুত রাজাদের ও রানীদের ত্যাগ, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা। ভারতীয় ইতিহাসে যে কজন বীরাঙ্গনার নাম জানতে পারি রানী পদ্মিনী তাদের মধ্যে অন্যতম। রাজমাতা না হয়েও তিনি ছিলেন সারা মেবারের 'মা'। তার অপমানে যেভাবে সারা মেবার আলাউদ্দিন খিলজি-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চিতোরের দূর্গে দাঁড়িয়ে তা ভাবতে শরীরে কাঁটা দেয়। এই গড়ের একদিকে যেমন রানী পদ্মিনীর জহরব্রত কুন্ড, যেখানে রানী নিজে কয়েক হাজার রাজপুত মহিলাকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন আর অন্যদিকে মীরাবাঈ-এর শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। হিংসা আর প্রেমের কি সুন্দর সহাবস্থান। সন্ধ্যা হয়ে এলো, পুস্করে ফেরার তাড়া, ফিরে চললাম পুস্করে। ফেরার পথে অদ্ভুত সুন্দর এক দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইলাম। সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমার পরদিন। অন্ধকারের মধ্যে চিতোরের বিজয়স্তম্ভ আর তার পাশে জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ যেন যুগ যুগ ধরে চিতোরের কীর্তিকে তাঁর উজ্জ্বল আলোর মতো উজ্জ্বল করে রাখার পণ করেছে। রাত ১১টায় আমরা পৌঁছলাম পুস্করে। হিন্দুদের এক পবিত্র তীর্থ। পরদিন সকালবেলা আমরা গেলাম পুস্করের ব্রহ্মার মন্দিরে। সারা

পুস্কর লেক

আজমীর শরীফ

ভারতে ব্রহ্মাদের একমাত্র মন্দির এই পুস্কর। পুরাণে বলে ব্রহ্মার হাতের পদ্ম পড়ে এই পুস্করে এবং তার থেকেই পুস্কর হ্রদ তৈরি হয়েছিল। এই হ্রদে স্নান করলে নাকি সব পাপ দূর হয়। তবে আমরা স্নান না করে শুধু জলে হাত ডুবিয়েই মন্দিরে চললাম। তারপর ফিরে চললাম আজমের বা আজমীরে। পুস্করে যেমন হিন্দু পবিত্র তীর্থ অজমীর তেমনি মুসলমানদের। এখানে ফকির মইনউদ্দিন চিস্তির দরগা আছে। সারা পৃথিবী থেকে ধর্ম প্রাণ মুসলমানরা ও অন্যান্য নানা ধর্মের লোক এখানে আসে তাদের মনের বাসনা পূর্ণ করতে। এই দরগায় ঢোকার মুখে দুটি হাঁড়ি আছে। এর বিশালতা দেখার মতো, আর দরগার সামনে আছে আড়াই দিন কা ঝোপড়া।

সব দেখা শেষ হল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। রওনা হলাম জয়পুরের দিকে, আমাদের ড্রাইভার বলল, যাবার পথে পড়বে মাকরাণ বলে একটা জায়গা। জয়পুরের বিখ্যাত মার্বেলের খনি এখানেই। আর এখান থেকেই মার্বেল নিয়ে শাজাহান তাজমহল তৈরি করেছিলেন। এরপর যা হয় মাকরাণে পৌছে, আমরা নেমে পড়লাম, সারি সারি দোকান মার্বেলের জিনিসে ভর্তি। কোমরে কাপড় গুঁজে নেমে পড়লাম কেনাকাটা করতে। জয়পুরে ফেরার তাড়া গাড়ি ধরা প্রায় ভুলে গেছি। মুগ্ধ হয়ে দেখছি, আর কি কিনব আর না কিনব বুঝতে না পেরে এ দোকান ও দোকান ছুটে বেড়াচ্ছি। এরই মাঝে বিশাল ধমক, 'গাড়ি কি আজ মিস্ হবে?' ব্যাস কোন কথা না বলে যে যা নিয়েছিলাম তাই নিয়েই সোজা গাড়িতে। অবশেষে বিকেল ৫.০০টার সময় জয়পুরে পৌঁছালাম। শেষবারের মতো জয়পুর শহরকে বিদায় জানিয়ে, আমরা কলকাতার দিকে চললাম, কিন্তু মন তখনও রয়ে গেল রাজপুতনায়। পরদিন কলকাতায় পৌছে শুরু হলো রোজনামচা।

ছোট্ট মানুষ টিনটিন

শ্রীমতি কল্যানী দাশগুপ্ত

ছোট্ট মানুষ টিনটিন, একেবারেই একরত্তি ছেলে। জগৎ-সংসারে নিতান্তই নবাগত। মাত্র একবছরের পরিচয় তার চারিদিকের এই আবাক পৃথিবীটার সঙ্গে। তাই বলে সে ঘাবড়ায় না মোটেই। মুখে বিশ্বজয়ের হাসি আর চোখে অগাধ কৌতুহল নিয়ে অনবরতই কাজে-অকাজে ভারী ব্যস্ত সে। কত যে বিস্ময় তার চারিদিকে—তাই সারাদিন চলে তার টানা, ফেলা, ছোঁড়া ভাঙার খেলা। প্রাজ্ঞ সে—সবই তার কাছে খেলনা বই তো নয়। আমরাই মূর্খ—তাই শুধু মরি ধর্ ধর্—গেল গেল ক'রে।

'আমরা বলতে তার দাদু-ঠাকুমা ও পিসী। আমাদের কাছে সে এসেছে একমাস কাটাতে—তার বাড়ী ও মা-বাবাকে ছেড়ে। সঙ্গে তার সর্বক্ষণের পরিচারিকা—ভিনদেশী এক মেয়ে; 'নীলা' তার নাম। তাই বাড়ির মেজাজটাই পাল্টে গেছে। সারাদিন বইছে অন্যরকম এক টাটকা খুশীর হাওয়া। বাড়ীটার চেহারাও তো কেমন বদলে গেছে। সারা বাড়ি জুড়ে তার রাজত্ব—তাকে নিয়েই সবার ব্যস্ততা আর হাসি, খেলার ধূম। কাজে মন নেই কারও। সারা বাড়িতে ঈশ্বরের মত সর্বক্ষণ সর্বব্যাপী তার প্রকাশ। হামাগুড়িতে সে বিশেষ পারদর্শী। চোখের নিমেষে ক্ষিপ্রগতিতে প্রতিটি ঘর ও তার আনাচে কানাচে পৌঁছে যায় সে। দুষ্টু হেসে উঁকি মেরে মেরে সবার সঙ্গে চলে তার লুকোচুরি খেলা। দু-পায়ে সবে মাত্র চলতে শিখেছে, তাই কিছুটা টলোমলো অবস্থা। ঘাড়টা একদিকে কাত করে সে হাঁটে, পড়ে, আবার ওঠে আর চলে। সে ভারী মজার দৃশ্য। কত কথাই যে বলার চেষ্টা—আমরা তার এক বর্ণও বুঝি না। তাতে তার কী বা এসে গেল? সে তো সব বিষয়ে তার বক্তব্য ও মতামত জানিয়ে চলে নিজের খেয়াল খুশিমতো। আমার বাড়ির খাট ও সোফাগুলিতে তার চড়া ও নামার কসরত চলতেই থাকে। না পারলেই ভীষণ মেজাজ খারাপ, আর পেরে গেলে সে কি আনন্দ। একেবারে পর্বত চূড়া জয়ের আনন্দ তার মুখে। রাতে সে আমাদের কাছে ঘুমোয়। দাদু-ঠাকুমার মধ্যিখানে তার ছোট্ট বিছানা। তবে বিছনাটা নামেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সারা খাট জুড়ে পৃথিবীর মত ঘুরতে থাকে সে। তার ঘুমন্ত মিষ্টি মুখটাতে কী যে মায়া—দেখে দেখে আশ মেটে না আমার। তার পিসী খুব বিজ্ঞের মত আমাকে সাবধান করে আর বলে—'বেশী মায়া কোরো না, ও এখানে থাকবে না চিরদিন, কদিন পরেই ফিরে যাবে নিজের জায়গায়, বাবা-মায়ের কাছে।' সে কথাটা কি আর জানি না? তবু মায়ার বন্ধন বড় সহজ নয়। আবার চোখের সামনেই দেখছি নীলাকে—ফিলিপিন্সে মেয়েটি, যে টিনটিনের সঙ্গে এসেছে তার দেখভাল করার জন্য। তার কথাটাও তো না বললেই নয়। কী অসম্ভব যত্নে, ভালোবাসায় সে টিনটিনকে সারাক্ষণ সামলায়। তার জন্য করণীয় যা কিছু—সবটুকুই করে নিপুণ হাতে, নিরলস মমতায়। কাজে বিন্দুমাত্র ফাঁকি নেই, কখনও ধৈর্য্যচুতি ঘটতে দেখি না তার। দুরন্ত শিশু, তাকে সবসময় চোখে চোখে রাখে অতন্দ্র প্রহরীর মত। তাদের দুটিতে ভারী ভাব—কত যে খেলা, কত যে কথাবার্তা চলে নানারকম ছড়া ও গান গেয়ে টিনটিনকে ঘুম পাড়ায় সে। তারপর সেরে নেয় নিজস্ব যা কিছু কাজ। সত্যিই মাতৃসমা সে, তার স্নেহে ভেজাল নেই এতটুকু।

আমি বসে বসে দেখি আর ভাবি, মেয়েটিতো চিরদিন থাকবে না। টিনটিন ক্রমশ বড় হবে, নীলাও হয়তো চলে যাবে আবার কোথাও, নতুন কোনও কাজে। এত যে ভালোবাসা আর টান সে সব তো ভুলে যাবে দুজনেই। কোনও দাবী কোনও বন্ধন ছাড়াই মেয়েটি নিঃশব্দে, আনন্দে, তার কর্ত্তব্য করে চলে। কী অসামান্য অবদান তার টিনটিনকে বড় ক'রে তোলার পেছনে। তবু কোন পিছুটান রাখা তো চলবে না তার। একেই কি বলে 'কর্ম্ম্যন্যোবাধিকারস্তে....? এজন্যই কি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'সংসারে কাজের লোকের মত থাকতে হয়'। শুধুই হাসিমুখে নিজের কাজ করে যাওয়া, নিরাসক্ত হয়ে, মায়া মোহ মুক্ত হয়ে? সেটাও যে অসম্ভব নয় তাই যেন দেখিয়ে দিলেন ঈশ্বর। এভাবেই সংসার কত কিছু যে দেখায়, শেখায় আমাদের। আমরা শিখতে পারি কই? শুধু সবকিছুই আমার আমার ভেবে কষ্ট পাই।

বাড়িটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল একেবারে। টিনটিন ফিরে গেল তার নিজের জায়গায়। মনটাও কেমন যেন ফাঁকা লাগে। আমারও তো বাসা বদলের দিন এগিয়ে আসছে ক্রমশ। সেদিন পারব তো এমনি করেই পিছন ফিরে না তাকিয়ে চলে যেতে? সংসারটা যে নিজের বলেই জানি! পারব কি গাইতে 'এ পরবাসে রবে কে?'

মূল্যবোধ ও আমরা

অমিত হবিষ্যাসী

আপনাকে যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি আপনার সন্তানকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে কি আদর্শ শেখাবেন? খানিকটা সময় নিয়ে আপনি হয়ত বলবেন; ওকে শেখাব ধনী হতে বা শিক্ষিত হতে বা প্রতিষ্ঠিত হতে, হয়ত বা সমস্ত পরিবেশে মানিয়ে চলতে কিম্বা স্বার্থপর হয়ে জীবনে স্বনামধন্য হয়ে বিদেশে যেতে নতুবা বলবেন, শেখাব সমাজের কাজে জনগনের উপকারে লাগতে বা অন্য আরও অনেক কিছু...

কিন্তু আমি বলি কি! উপরের সবগুলোই সম্ভব হবে আপনি আপনার সন্তানকে প্রথমেই প্রকৃত অর্থেনৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক কর্তব্য ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে বলেন, সেটা হবে সবচেয়ে উপযোগী। বিষয়টির আলোচনা যদিও সুদূর প্রসারী তবে কয়েকটি বাস্তবিক ঘটনা ও তার আলোচনা আমাদের একটা নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছে দিতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।

নৈতিক মূল্যবোধ কথাটির অর্থ মূল্য সম্পর্কে নীতিগত উপলব্ধি বা চেতনা, এই মূল্যবোধ মানুষের নানা দিক থেকে হতে পারে যেমন—শিক্ষা, সময়, শিষ্টাচার, শৃঙ্খলা ইত্যাদি। আর সমাজের উন্নতিকল্পে যে কোন বিষয়ক কর্তব্যই হল সামাজিক কর্তব্য। প্রথমেই বলব মূল্যবোধ বা সামাজিক কর্তব্য শুরু হয় কিছু প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে বাড়ী থেকেই আর তা পরিনত হয় স্কুল কলেজে। যেমন ধরুন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আপনি দেখলেন রাস্তার লাইট দিনের বেলায় জ্বলছে বা দেখলেন রাস্তার কল থেকে অনবরত জল পড়ছে আপনার উঁচিত নয় আপনার সন্তানকে বলা যা বাপ লাইট বা কলটা বন্ধ করে আয়। অনেকে আবার বলে সরকারের যাচ্ছে তো তোর অত মাথা ব্যথা কেন? সেই অজ্ঞরা জানে না যে সরকার মানে অন্য গ্রহের কোন প্রাণী নয়, আমরা নিজেরাই এর অন্তর্গত। জল ও বিদ্যুৎ অপচয় মানে প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রচুর অর্থের অপচয় যার প্রভাবে আগামী দিনে আমাদেরও কষ্ট করতে হতে পারে জল বা বিদ্যুতের কারণে।

বাড়ী, পাড়া, স্কুল কলেজ প্রভৃতি জায়গাগুলো পরিবেশ বান্ধব করে তোলার উদ্দেশ্যে অযথা নোংরা করা একেবারেই ঠিক না, চানাচুর-মুড়ি খেয়ে, প্লাস্টিক প্যাকেট পথ মধ্যেই ফেলে দিলাম, কুরকুরে লেসের প্যাকেট হামেশাই আমাদের বাচ্চারা খাচ্ছে আর প্যাকেটগুলো যত্রতত্র ফেলে নোংরা করছে পরিবেশ, আমরা কি পারি না ছোটো ছোটো শিক্ষাগুলো বাড়ী থেকেই দিতে আমাদের বাচ্চাদের যাতে ওরা শেখে যে নোংরা জিনিস ফেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা থাকে এবং ওখানেই এগুলো ফেলা উচিত অনথায় পরিবেশ ক্রমশ নোংরা হবে তাতে আখেরে ক্ষতি আমাদের সকলের।

আমরা অনেক শিক্ষিতরাও অনেক সময় বাড়ির নোংরা ভ্যাটে না ফেলে রাস্তার এক পাশে ফেলে রাখি, আবার বাজারে যাওয়ার সময় ব্যাগ না নিয়ে গিয়ে প্লাস্টিকে করে জিনিসপত্র আনি, এ ব্যাপারে যদি এখনও আমরা সজাগ না হই তাহলে কিভাবে আমরা আমাদের বাচ্চাদের প্রাথমিক সঠিক শিক্ষা দেব কিভাবেই বা তৈরী করব তাদের নৈতিক মূল্যবোধ তাই বলি এখন থেকেই আমরা পরবর্তী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে শুরু করি পাটের ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাওয়া এবং অপরকেও এ ব্যাপারে সজাগ করি আর বাড়ির নোংরা ভ্যাটে ফেলার অভ্যাস শুরু করি এখন থেকেই তাহলেই আমাদের বাচ্চারাও অনুরূপে অভ্যাসে অভ্যস্ত হবে।

আবার ধরুন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখি খুব বেশি হলে ১২-১৩ বছরের ছেলে সিগারেট ধরিয়ে চলেছে এমনকি গাড়ীর মধ্যেও নির্দ্ধিধায় টেনে চলেছে সিগারেট আর চলছে অশ্লীল কথাবার্তা—আমরা কি পারি না সামান্য প্রতিবাদ একত্রে করে তাদের এটুকু শেখাতে যে বয়স না হলেও কোনও নেশাতেই আসক্ত হওয়া যেমন অসামাজিক তেমন শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। ট্রেনের টিকিট বা গ্যাস বা লাইট অফিসে বা ব্যাঙ্কে আমাদের সর্বদাই একটা নির্দিষ্ট লাইন অনুযায়ী কাজ করতে হয়, এর মধ্যেই আবার মাঝেমাঝে দেখি কয়েকজন বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে আগে কাজ সাড়ার চেষ্টা করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি করেন, তাকে কি আমরা এটা বোঝাতে পারি না যে ব্যস্ততা কমবেশি সবারই আছে, সকলেরই প্রয়োজন একই রকম, তারমধ্যে নিয়ম ভাঙলে আমাদেরই ক্ষতি, শৃঙ্খলা মেনে চলতে শিখলে ও শেখালে জীবন অনেক সহজ সরল ও নৈতিক হয়। নৈতিক মূল্যবোধের আলোচনায় সময়ানুবর্তিতার কথা উল্লেখ না করলে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যায় সময় মত কাজ করা বা সঠিক সময় সঠিক পদ্ধতিতে গুরুত্ব সহকারে যে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী, আর যাদের মধ্যে সময় সম্পর্কে সচেতনতা তেমন প্রগাঢ় নয় অর্থাৎ করলেই হল—হয়ে যাবে কোন এক সময় ইত্যাদি বক্তব্যগুলি খুবই আপত্তিকর তাই

আমাদের শিশুকে এই বিষয়েই সজাগ করিয়ে দেওয়াটা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

এতক্ষণ আলোচনার বিষয়গুলি ছিল নৈতিকমূল্যবোধ সংক্রান্ত এবার আসা যাক কিছু সামাজিক কর্তব্যবোধে যেমন ধরুন,

কোনও লোককে কোনও ব্যাপারে কথা দিয়ে আশ্বস্ত করে মারাত্মক মাত্রায় উদাসীন না হয়ে আমরা কি পারি না এ ব্যাপারে আরও সচেতন হওয়ার জন্য মানসিকভাবে দৃঢ় হতে, কারণ সময়ানুবর্তিতা ও কথার দাম রাখা এক অন্যতম মূল্যবোধ ও সামাজিক কর্তব্যও বটে। ট্রেনে যেতে যেতে দেখলেন কয়েকজন তাস খেলতে খেলতে বিড়ি বা সিগারেট ধরিয়ে বা বাদামভাজা খেয়ে ট্রেনটাকে নোংরা করে এগিয়ে চলেছে তাদের গন্তব্যে। আসুন না ২-১ জন মিলে মিষ্টি ভাষায় তাদের বোঝানোর চেষ্টা করি যে চলন্ত গাড়ীতে বিড়ি/সিগারেট খাওয়াটা অপরাধের এবং বিপজ্জনক। তাছাড়া ট্রেন নোংরা করাটাও অন্যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ওরা দল-বেঁধে যায়, যদি কিছু বলে? না! বলবে তো বটেই, তবে ভালোভাবে কয়েকজন মিলে বোঝালে একদিনে না হোক কয়েকদিনের লাগাতার চেষ্টায় নিশ্চয়ই ওদের মনেও অন্যায়বোধ জাগ্রত হবে, আর সেদিন থেকেই ওরা বিরত হবে এসব কাজে।

আপনি যখন দেখেন দুজন কিশোর কিশোরী আপনার সামনে অসংলগ্ন আচরণ করছে আপনি কি পারেন না এই শিক্ষা দিতে যে সব জায়গা সবকিছু করার জন্য প্রযোজ্য নয়, তাছাড়া সবকিছুরই একটা সমাজগ্রাহ্য সীমা আছে। তাকে লঙ্ঘন করা অন্যায়, এই প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের না থাকলে তারা নৈতিক মূল্যবোধ ও সামাজিক কর্তব্য বোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।

পাহাড়ি অঞ্চলে কাঠ ব্যবসায়ীরা কাঠের উদ্দেশ্যে মাইল মাইল গাছ জঙ্গল সাফ করে ফেলছে, সরকারী অনুমতি ছাড়া এভাবে বনচ্ছেদ যেমন নষ্ট করছে বনভূমিকে একই সাথে নষ্ট করছে পরিবেশের ভারসাম্য আর পাহাড়ি সৌন্দর্য্য।

ফ্ল্যাট বানানোর তাগিদে পুকুর ভরাট বা খেলার মাঠ ব্যবহার তো আজকের রোজকার ঘটনা, কিন্তু সরকারকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের মুনাফার তাগিদে এভাবে পুকুর ভরাট বা বাচ্চাদের খেলার জায়গায় থাবা বসানো তাদের প্রাথমিক চিন্তাভাবনার অভাবকেই বোঝায়—আসলে কিছু হোক বা না হোক বিষয়টা নিয়ে স্থানীয় প্রতিনিধিমহল অর্থাৎ মিউনিসিপালিটি বা পঞ্চায়েতে অন্ততঃ অবগত করা দরকার—তা না হলে তো আমরাই আমাদের সামাজিক কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছি।

এ সমস্ত বিক্ষিপ্ত বাস্তব ঘটনা বাস্তবে প্রতিনিয়ত প্রচুর ঘটছে, আশ্চর্যজনকভাবে আমরা সবকিছু দেখছি, শুনছি, খুব বেশি হলে সমালোচনা করছি আর নির্বাক হয়ে 'কিছু করার নেই' বলে মেনে নিচ্ছি, কিন্তু সকলে এভাবে মেনে নিলে তো সামাজিক সংস্কার হবে না, ভুল ভুলই থেকে যাবে, নৈতিক মূল্যবোধ বা সামাজিক কর্তব্যবোধ কোনও প্রজন্মেই তৈরি হবে না। আগেকার দিনে এসব খানিকটা লক্ষ করা গেলেও বর্তমানে এর খুবই অভাব লক্ষণীয় আধুনিকতার স্পর্শে এগুলো যেন ক্রমশই শিথিল হয়ে পড়ছে।

তবে খেয়াল রাখার যে প্রকৃতপক্ষে নৈতিকমূল্যবোধ ও সামাজিক কর্তব্যবোধই জীবনের সাফল্য অর্জনের সোপান। মানব সভ্যতায় বর্তমান চরম বিকাশের মূল্যেও আছে মানুষের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত মূল্যবোধ। শিশু জীবনই মূল্যবোধ জাগরণের উপযুক্ত সময় কারণ এই সময়ই কোমল মানব ভূমিতে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ ও সামাজিক কর্তব্য বোধের প্রাথমিক শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং উত্তরকালে তাতে অমৃত ফল ধরে।

মানুষের মূল্যবোধহীনতা সভ্যতার অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করে দুর্লভ্য বাধা। জীবনকে পরিণত করে শুষ্ক মরুভূমিতে তাই মানব জীবনে নানাদিকের মূল্যবোধের মাধ্যমে বর্তমানের যে নৈরাশ্যবোধ তা অপসারিত করে অচিরে নতুন আশা ও আদর্শের সূর্যোদয় ঘটাতে হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার্থে, পরিবেশ বান্ধব সমাজ গড়তে আমরা যদি আগামী প্রজন্মের মধ্যে সামান্য চেতনাও জাগ্রত করতে পারি তাহলেই সামান্য হলেও সমাজের উপকার হবে। পরবর্তী প্রজন্মকে কেবলমাত্র ভালো নম্বর, ভালো পারফরমেন্স, নাচ-গান-কবিতা বা আঁকায় এক নম্বর হওয়ার দৌড়ে না পাঠিয়ে একই সাথে যদি ভালো স্বভাব, ভালো চরিত্র, নম্র ভদ্র, গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রাথমিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করাটাও আমাদের নৈতিক কর্তব্য। আমরা শিক্ষিত সমাজ যদি এ ব্যাপারে সজাগ না হই, কিভাবেই বা শিশু সমাজ শিখবে যে 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'।

নিষ্ঠুর মজা

অজয় মল্লিক

'The Planning Commission may revise the norms of per capita amount looking into price index of May 2011 or any other subsequent dates'—গত ১৪ মে ২০১১ সুপ্রিম কোর্ট যোজনা কমিশনকে এই নির্দেশ দেন। কারণ যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হলফনামায় জানানো হয় যে শহরে বসবাসকারী যে মানুষদের দৈনিক ব্যয় বহনের ক্ষমতা ২০ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে

প্রকৃতই ধনী!

সুপ্রিম কোর্টে যোজনা কমিশনের দাখিল করা হলফনামা অনুসারে দিল্লির ঝুপড়িতে বসবাসকারী ৫ সদস্য বিশিষ্ট এই পরিবার বড়লোক। কারণ এদের মাসিক ব্যয় করার ক্ষমতা ৪৮২৪ টাকা। [সৌজন্যে ঃ Outlook, 03 Oct., 11]

বসবাসকারী যে মানুষদের দৈনিক ব্যয় বহনের ক্ষমতা ১৫ টাকা, তাদের আর দরিদ্র বলে বিবেচনা করা হবে না। ফলে গরিব মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতার মধ্যে তাঁদের আর যুক্ত করা যাবে না।

সুপ্রিম কোর্ট যোজনা কমিশনের পেশ করা হলফনামায় সন্তুষ্ট হতে পারে নি এবং মাননীয় বিচারপতিরা মে ২০১১ অথবা পরবর্তী কোনও মাসের মূল্য সূচকের

For healthcare, Rs. 39.70 per month is felt to be sufficient to stay healthy, believes the Planning Commission. On education, the Plan panel feels those spending 99 paisa a day or Rs. 39.60 a month in cities are doing well enough not to need any help. Similary, one could not be considered poor if he or she spends more than Rs. 61.30 a month on clothing, Rs. 9.6 on footwear and another Rs. 28.80 on other personal items. The new tentative BPL criteria was worked out by the Planning Commission and approved by the PMO before the government's affidavit was submitted before the apex court. [The Times of India, 21.09.2011]

উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হলফনামা দাখিল করার নির্দেশ দেন।

সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১১ যোজনা কমিশন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে পরিবর্তিত একটি হলফনামা সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করে। এই হলফনামায় যোজনা কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শহরে বসবাসকারী যারা মাসে ৯৬৫ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ৩২ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলে বসবাসাকারী যারা মাসে ৭৮১ টাকা অর্থাৎ দৈনিক ২৬ টাকা খরচ করতে পারেন তারা আর দরিদ্র বলে বিবেচিত হবেন না। যোজনা কমিশনের হিসাবে শহরে একজন মানুষ দৈনিক ৩২ টাকা এবং গ্রামে একজন মানুষ দৈনিক ২৬ টাকা খরচ করতে পারলে তাতে সুনিশ্চিত হয় তাদের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানখাতে প্রকৃত ব্যক্তিগত খরচের পর্যাপ্ততা।

অর্থাৎ যোজনা কমিশনের হিসাব অনুসারে দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর বা কলকাতায় বসবাসকারী ৫ সদস্য বিশিষ্ট এক পরিবারের মাসিক ব্যয় করার ক্ষমতা ৪৮২৪ টাকা হলে তিনি আর দরিদ্র বলে বিবেচিত হবেন না।

শহরের মানুষের এই ৩২ টাকার মধ্যে ১৮ টাকা খাদ্যের জন্য খরচ এবং ১৪ টাকা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যাতায়াত ইত্যাদির জন্য খরচ হবে বলে হিসাব করা হয়েছে। গ্রামের মানুষের জন্য খাদ্য বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ১০ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ১৬ টাকা।

গত ৫ বছরে চাল, ডাল, দুধ, সবজি, তেল, মশলার দাম বেড়েছে ৭২ শতাংশ। অথচ যোজনা কমিশনের হিসাব অনুসারে মাথাপিছু দৈনিক ৫.৫০ দানাশষ্য বাবদ, ১.০২ ডাল বাবদ, ১.৯৫ সবজি বাবদ, ১.৩৫ ভোজ্য তেল বাবদ খরচ করতে পারলে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান সম্ভব। জ্বালানী

বাবদ যে মানুষের দৈনিক ব্যয় করার ক্ষমতা ৩.৭৫, তিনি আর গরিব বলে বিবেচিত হবেন না।

শহরে বসবাসকারী যে মানুষ মাসে বাড়ি ভাড়া এবং যাতায়াত বাবদ ৪৯.১০ খরচ করতে পারবেন, তিনি আর গরিব বলে বিবেচিত হবেন না।

যোজনা কমিশনের হিসাবে স্বাস্থ্যখাতে মাসে মাথাপিছু ৩৯.৭০ খরচ করতে পারলে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব। অর্থাৎ দৈনিক ১.৩২ পয়সা চিকিৎসা খাতে খরচ যোজনা কমিশনের হিসাবে যথেষ্ট।

'আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্রিকা 'দি ল্যানসেট' এর তথ্য অনুসারে প্রতি বছর ভারতের তিন কোটি নব্বই লক্ষ মানুষ শুধুমাত্র চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে গিয়ে দারিদ্র সীমার নিচে চলে যাচ্ছে।'

গত ০৩.১০.১১ Times of India পত্রিকায় "India registered the highest number of child and maternal deaths world wide in 2011" এই শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রতিবেদনের তথ্য অনুসারে ২০১১ সালে ভারতবর্ষে জন্মের ৬ দিনের মধ্যে ৬,৯৭,০০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ইথিওপিয়ায় এই সময়কালে মৃত্যু হয়েছে ৬৪,০০০ শিশুর। ভারতবর্ষে ৫ বছরের জন্মদিন দেখার সুযোগ হয়নি ১৬,৪৭,০০০ শিশুর, ইথিওপিয়ায় এই সংখ্যা ১,৫৩,০০০। ২০১১ সালে ভারতে বাচ্চার জন্ম দিতে গিয়ে ৫০,০০০ মায়ের মৃত্যু হয়েছে। ইথিওপিয়ায় আলোচ্য সময়ে ১৩,০০০ মায়ের মৃত্যু হয়েছে।

যোজনা কমিশনের হিসাবে মাসে মাথাপিছু ২৯.৬০ অর্থাৎ দৈনিক ০.৯৯ পয়সা শিক্ষাখাতে খরচ যথেষ্ট। তাই যে পরিবার শিক্ষাখাতে এই পরিমান অর্থ খরচ করতে পারেন, তারা আর গরিব বলে বিবেচিত হবেন না।

জামা কাপড়ের জন্য মাসে ৬১.৩০ এবং জুতোর জন্য মাসে ৯.৬০ খরচ করার ক্ষমতা যে মানুষের আছে তাদের আর গরিব বলে ধরা হবে না।

সুপ্রিম কোর্টে যোজনা কমিশনের দাখিল করা হলফনামায় জানানো হয়েছে 'The recommended poverty lines ensure the adequacy of actual private expenditure per capita near the poverty lines on food, education and health and the actual calories consumed are closed to the revised calorie intake norms for urban areas and higher than the norms in rural areas." ন্যাক (National Advisory Council) এর দুই সদস্য অরুণা রায় এবং হর্ষ মান্দার যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়াকে একটি খোলা চিঠিতে প্রশ্ন করেছেন "If Rs. 25 for rural areas and Rs. 32 for urban areas per capita expenditure was 'adequate' then it is not clear to us why planning commission members are paid upto 115 times the amount (not counting the perks of free housing and health care and numerous other benefits) that are enjoyed by you and members of the planning commission, the letter said." [TOI, 30.09.11] অর্থাৎ মন্টেক সিংদের মতে যদি দৈনিক ৩২ টাকা খরচ যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় তবে মন্টেক সিং এবং যোজনা কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের বাড়ি ভাড়া, স্বাস্থ্যখাতে খরচ এবং অন্যান্য বহুবিধ সুবিধা ছাড়াও দৈনিক (৩২×১১৫) বা ৩৬৮০ টাকা ভাতা দেওয়া হয় কেন? এই প্রশ্নের কোনো জবাব এখনও মন্টেক সিং বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি।

মন্টেক সিং এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা নীরব। কারণ মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতির আগুনের আঁচ এদের গায়ে লাগে না। 'Inflation & food prices, are unlikely to affect their monthly house hold budget. At 77% of union council of ministers are crorepatis, whose average asset value is pegged at Rs. 10.3 crore—Rs. 3 crore higher than their declaration two years ago" [TOI 16.09.11]. কংগ্রেস-তৃণমূল-ডিএমকে পরিচালিত ইউ পি এ ২ সরকারের মন্ত্রীসভার ৭৭% কোটিপতি। তাদের গড় সম্পদ ১০.৩ কোটি টাকা।

গত ২১.০৯.১১ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী পি সাইনাথের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই লেখায় তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সম্পদ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার হিসাব দিয়েছেন। মে '০৯-এর নির্বাচনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রফুল প্যাটেল হলফনামায় ঘোষণা করেছিলেন যে তার সম্পত্তির পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকা। ২০১১ সালের নির্বাচনী হলফনামায় তার ঘোষিত সম্পদের পরিমাণ ১২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ ২৮ মাসে তার সম্পদ দৈনিক ৫ লক্ষ টাকা হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি একসময় অসামরিক বিমান দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। এয়ার ইন্ডিয়ার ৪০% কর্মচারীর এক বছরের আয় মন্ত্রীর একদিনের আয়ের চেয়ে কম। অথচ এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মচারীদের বেতন প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য মিলান্দ দেওরা ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১১ সালের নির্বাচনী হলফনামায় জানিয়েছেন তার সম্পত্তির পরিমাণ যথাক্রমে ৮.৮ কোটি, ১৭ কোটি এবং ৩৩

কোটি। অর্থাৎ গত ৭ বছরে তার সম্পদ বৃদ্ধির হার দৈনিক ১ লক্ষ টাকা।

অন্ধ্রের প্রয়াত কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র ওয়াই এস জগমোহন রেড্ডি। ২০০৯ সালে তার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি টাকা। ২০১১ সালে এই পরিমান ৩৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ সম্পদ বৃদ্ধির হার দৈনিক ৫০ লক্ষ টাকা।

যোজনা কমিশন তথা কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য গৃহীত বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণে বরাদ্দ কমানো যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের গুদামে ৬ কোটি টন খাদ্য শস্য পচে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য না পচিয়ে গরিব মানুষের মধ্যে বন্টন করার। কেন্দ্রীয় সরকার এই নির্দেশ মানছে না। অজুহাত আর্থিক সংকট।

গত ৭ সেপ্টেম্বর '০৯ 'দি হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে গোটা বিশ্বের মধ্যে ভারতে মোট আভ্যন্তরীণ আয়ের অনুপাতে প্রত্যক্ষ করের অংশ সবচেয়ে কম, ভারতের আয়কর আইন অনুসারে কোনো কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বেতন, বোনাস বাবদ বার্ষিক আয় যদি ৩০ কোটি টাকা হয় এবং ডিভিডেন্ড বাবদ আয় যদি বার্ষিক ১০০০ কোটি টাকা হয় অর্থাৎ বেতন ও ডিভিডেন্ড বাবদ সেই ব্যক্তির বার্ষিক আয় ১০৩০ কোটি হলে তিনি আয়কর দেবেন ১০ কোটি টাকা অর্থাৎ তার মোট আয়ের মাত্র ০.০১%। কারণ আয়কর আইনের ১০(৩৪) ধারা অনুসারে ডিভিডেন্ড বাবদ আয়ের উপর কোনো আয়কর দিতে হয় না।

কোটিপতি মন্ত্রীসভার সদস্যরা আজ দেশ চালাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই মুষ্টিমেয় শত কোটিপতিদের শ্রেণি স্বার্থরক্ষা করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই যোজনা কমিশনের সুপ্রিম কোর্টে পেশ করা হলফনামার বিরুদ্ধে যখন গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তখনও মন্টেক সিং দম্ভের সাথে জানান "The fact is that Rs. 4824 per month for a family [of five] to define poverty is not comfortable but it is not all that ridiculous in Indian conditions" Mr. Ahluwalia said in a letter to Attorny General Goolam Vahanbati' [The Hindu 12.10.11]

অর্থাৎ ভারতের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারে মাসিক আয় ৪৮২৪ টাকা হলে তা আরামদায়ক নয় কিন্তু তারা যে গরিব নন, একথা স্বীকার করা কোনোভাবেই হাস্যকর নয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ৭৭% কোটিপতি, দৈনিক ৫ লক্ষ টাকা আয়ের মন্ত্রীও মন্ত্রীসভায় আছেন। আর যাদের শ্রেণি স্বার্থ রক্ষা করতে এরা মন্ত্রী হয়েছেন তাদের প্রতি মিনিটে আয় কত! ২০০৭ সালের ৮ অক্টোবর Times of India-তে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে 'In the last three months, Reliance Industreis chairman Mukesh Ambani increased his wealth by roughly Rs. 40 lakh every single minute'.... প্রতি মিনিটে আয় বৃদ্ধি ৪০ লক্ষ টাকা। তাহলে মোট সম্পদের পরিমাণ কত? যে 'আমআদমীর' প্রতি মিনিটে আয় ২.২ পয়সা, যোজনা কমিশনের হিসাব অনুসারে আজ তিনি 'খাসআদমী'। কাজেই সামাজিক সুরক্ষার কোনো কর্মসূচীতে তারা আর অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এর চেয়ে নিষ্ঠুর রসিকতা আর কী হতে পারে?

বর্তমান সমাজের সামাজিক অবক্ষয় এবং তার প্রতিকার

অসিত মজুমদার

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তাই তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত সামাজিক কিছু নিয়মকানুন মেনে চলাই বাঞ্চনীয়। কিন্তু আমরা তার বিপরীত কিছু আচরণ সর্বদা করতে অভ্যস্ত। এই নিয়ম নীতিটা আমাদের মজ্জাগত দোষ ত্রুটির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। সমাজের বেশ কিছু বিধি আমরা বর্তমান সভ্যতায় মানতে নারাজ। যেমন বর্তমানে সারা দেশ, পৃথিবী সর্বপরি বৃহত্তর সমাজ আমাদের কিছু উপহার দিয়েই চলেছে, যেটা নাকি মানব জীবনকে কলুষিত করছে বারং বার। পিতা-পুত্রের কলহ, ভায়ে ভায়ে দাঙ্গা, পাড়া প্রতিবেশীর প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এবং যার ফলে আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধটুকু হারাতে বসেছি। সারাদেশ এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে

আচমকাই বিস্ফোরন-কুচক্রীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেখানে সাধারণ অগনিত মানুষের প্রাণহানী দেশ তথা সমাজের অমূল্য সম্পদের ধ্বংস, ক্ষয় হয়েই চলেছে। আর আমরা তার কতিপয় দর্শক শ্রোতার ভূমিকায় নির্বাক এক রাজনৈতিক পটভূমিকায় ভোটের হিসাব নিকাশ কষেই চলেছি। সামান্য স্বার্থের জন্য আমরা বিশাল ও মহৎ স্বার্থটাকে বির্সজন দিচ্ছি। ভোটের হিসাব নিকাশ ছাড়া আমরা এক পাও চলতে নারাজ।

তাই সেখানে যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন, দেশ তথা সমাজের মঙ্গল কামনার চেয়েও বড় হ'ল আমাদের ভোট বাক্সের ভারসাম্য রক্ষা। আর সেটা করতে গিয়েই আমরা আমাদের মানবিক মূল্যবোধটুকুও হারাতে চলেছি। এখানেই প্রকৃত শিক্ষার একটা অভাব আমাদের মধ্যে প্রবাহিত। বর্তমান সমাজের মানুষ আমরা শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা রূপে গ্রহণ করতে পারিনি, পুঁথিগত শিক্ষা গ্রহণ করে শুধু certificate গলায় ঝুলিয়ে বড় ডিগ্রি অর্জন করেছি। কিন্তু শিক্ষাকে আমরা অঙ্গীভূত করতে পারিনি। আর তারই ফলশ্রুতি আমরা পদে পদে ভোগ করেই চলেছি। 'রবীন্দ্রনাথ' বলেছিলেন যে, ইংরেজদের দেওয়া এই শিক্ষানীতিতে আমরা office-এর clerk তৈরী হতে পেরেছি কিন্তু নতুন কোন আবিস্কার করার ক্ষেত্রে এই শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারি নি। তাই সমাজের প্রতি সামান্যতম দায়টুকুই আমরা বহন করতে ভুলে গেছি। শিক্ষা বিজ্ঞানের (Education) ভাষায় বলা যায় শিক্ষার দুটি ভাগ (১) জীবিকার জন্য শিক্ষা, (২) জীবনের জন্য শিক্ষা। জীবিকার জন্য শিক্ষা মানে সংকীর্ণ শিক্ষা আর জীবনের জন্য শিক্ষা মানে বৃহত্তর শিক্ষা, যে শিক্ষার কোন গন্ডি বা পরিসীমা থাকে না, যে শিক্ষা সমাজের বৃহত্তর কাজ করতে সাহায্য করে। সেই শিক্ষা দেশ তথা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে, বর্তমান জীবিকার জন্য শিক্ষা অর্জনকারীরা দেশ তথা সমাজকে নোংরা রাজনীতি শেখাতে বদ্ধপরিকর ভূমিকা পালন করছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ পারসি, জৈন প্রত্যেকে আমরা মানুষের পরিচয় নিয়ে দেশ তথা সমাজে ভূমিষ্ট হয়েছি এবং প্রত্যেকের রক্ত আমাদের লাল। তাই হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি ত্যাগ করে একই ছত্রছায়ায় নতুন পথ চলার দিগন্তে আমরা যদি নতুন সমাজ গড়ার শপথ গ্রহণ করে একই মন্ত্রে দীক্ষিত হই যে, আমরা, সুষ্ঠ, সুন্দর দেশ, সমাজ গড়ব এবং সেখানে আমাদের কোন রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, দলাদলি, মারামারি কিছুই থাকবে না। থাকবে শুধু একটাই স্লোগান—নতুন একটা পরিচ্ছন্ন দেশ এবং সমাজ গড়তে আসুন সকলে এক হই এবং হাতে হাত মিলিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের ১৯০৫ সালের রাখী বন্ধন উৎসবকে স্মরণ করে সমাজের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যবান সময়কে আমরা কাজে লাগিয়ে শান্ত সমাহিত বৈরাগ্যের এক পরিবেশ গড়ে তুলি, আর সেই পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করি আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের আপন-আপন সত্ত্বা, যে স্বত্তায় শেষ কথা—''জাতি কিন্তু একটাই —মানবজাতি''।

পুঁজিবাদের টানে সমাজের বিবর্তন

জগন্নাথ রায়

পৃথিবীর জন্মলগ্নে ভেদাভেদ, স্বার্থপরতা, হিংসা, পুঁজিবাদ এইধরনের যত রকমের অশুভ প্রভাব, কু-প্রভাব আছে তার কোনটারই প্রভাব ছিল না। কারণ প্রকৃতির অনুপম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ তখন ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বৃক্ষফল-মূল আহার করত, আশ্রয় নিত বৃক্ষ ছায়াতলে, পদচারণ করত তথাকথিত অতি অনুন্নত বনবৃক্ষ তলে। মানুষ তখন সঠিকভাবে আজকের মতো মনুষ্যত্বের বিচারে ছিল—'আদিম মানুষ'। কালের বিবর্তনের ফলে সেদিনের সেই আদিম মানুষের বংশধররা উন্নীত হয়েছে—'পরিণত মানুষে'। সৃষ্টির এই অমোঘ পরিবর্তনে আজও মানুষ তথা সভ্যতার বিকাশ চলছে অবিরাম এবং এটাই চিরন্তন সত্য। পাঠককূলের কাছে পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাস অজানা নয়, এতদ্ সত্ত্বেও মানুষের বা মনুষ্যজাতির এই বিবর্তনের ধারাটি অতি সংক্ষেপে হলেও আমি এখানে উল্লেখ করলাম কেন? তার কারণ হল কোন বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হলে তার অতীত ইতিহাসটুকু একবার ঝালিয়ে নেওয়াটা জরুরী। যাইহোক,

আবার বিষয়ের মূল পর্বে প্রবেশ করি। আদিমকালে মানুষের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজন হয়—(১) খাদ্য (২) বস্ত্র (৩) বাসস্থান। তার ঠিক পরে মানুষের বেঁচে থাকার তাগিদে প্রয়োজন হল,—(১) খাদ্য, (২) বস্ত্র, (৩) বাসস্থান, (৪) আত্মরক্ষা, (৫) শিক্ষা-এই ভাবে বিবর্তনের প্রতিটি পর্যায়ে মানুষের জীবনধারনের চাহিদা দিনে দিনে বাড়তে থাকল। অবশেষে মানুষের ন্যুনতম চাহিদা একলাফে অনেকটা ধাপ বেড়ে মুখ্য চাহিদাতে ঠাঁই করে নিল, (১) অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, (২) কাজ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য, (৩) সম্পদ-সুখ ও ভোগ বিলাস, (৪) সামাজিক নিরাপত্তা, (৫) সম্মান-স্বীকৃতি ইত্যাদি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যত অগ্রগতি হয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যমাত্রা ততই ন্যুনতম চাহিদার গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর হয়েছে বিজ্ঞানের উদ্‌ভাবনি শক্তির দ্বারা যা যা সৃষ্টি হয়েছে তার নাগাল পাওয়ার জন্য। এইভাবে মানুষের আকাশচুম্বী জীবনযাত্রার মান রক্ষার চাহিদা দিনে দিনে তিলে তিলে বাড়তে বাড়তে অবশেষে গন্ডীর সীমা অতিক্রম করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে, এর ফলস্বরূপ মানুষের অগ্রগতির পথে ক্রমাগত উন্নতির ফলে মনুষত্ব ও সমাজের কক্ষপথে প্রবেশ করল অতি বিনষ্টকারী সব elements, শব্দের বিচারে বিশ্লেষণ করলে আমার বুদ্ধিতে যেটা দাঁড়ায় সেটা হল—(১) ভেদাভেদ, (২) স্বার্থপরতা, (৩) পুঁজিবাদ, (৪) মেরুকরণ ইত্যাদি। ফলস্বরূপ ভূ-গোলক আজ সংকটাপন্ন, অস্তিত্ব বিপন্নের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিচ্যুতি ঘটছে সমাজের প্রতিটি স্তরে। কেন একথা বলছি! তা জানতে অন্ততঃ আমার বিচার বুদ্ধির প্রয়োগের দ্বারা যেটুকু বুঝি তা বিশ্লেষণ করছি, সমাজের ও মনুষ্যত্বের কক্ষপথে প্রবেশ করা উল্লিখিত অংশগুলিকে নিয়ে—

ভেদাভেদ ঃ ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, জাত-পাত ভেদাভেদ চিরকাল স্ব-মহিমায় বিরাজ করছে। আজও ঘটে চলেছে নিরন্তর ভারতের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে জীবনধারন করেন, বাকি ৫৮ শতাংশ মানুষের গন্ডীতে রয়েছেন মধ্যবিত্ত, ধনী ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ (প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী)। ধনী ও গরিবের এই আনুপাতিক হারের ক্ষেত্রে একটা বৈষম্য লক্ষ করা যায়। কারণ মনে রাখা উচিত, বর্তমান সভ্যদেশে সাধারণ মানুষও তাঁদের জীবনধারনের ন্যুনতম চাহিদাকে অনেকটা বাড়িয়ে ফেলেছেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিলাপে গিয়ে আমার লেখাটা অতিবর্ধিত করতে চাইনা বলে প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাচ্ছি। যাইহোক, উপরিউল্লিখিত শতকরা হারটা বর্তমান আর্থ-সামাজিক ভারতে তথা বিশ্বেও অসংগতিপূর্ণ এবং ক্ষতি কারকও বটে। কারণ এখান থেকে শুরু হয়েছে মানুষের ক্ষোভ, জ্বালা, দুঃখ, ঘৃণা ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বার্থপরতা ঃ স্বার্থপরতার করাল ছায়া ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে, পঙ্গু করেছে অতিস্বার্থপরতার পদচারনায় গোটা বিশ্বকে। আসলে 'নিজেরটা যতটুকু বুঝি পরেরটা ততই কম বুঝি'। এই সারবত্তাটাই ধ্বংস করেছে মানুষের অন্তরের অন্দর মহলের মনুষ্যত্বনামক মানবিকতার হীরের টুকরোটিকে। এই ধরনের মানসিকতা গোটা সমাজের শিরায় শিরায়, ধমনী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিস্কে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে ক্ষরণ অবধারিত। আবার এই অতিস্বার্থপরতা মানুষে মানুষে সীমাবদ্ধ নেই। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ও এর ব্যাপ্তি সুদুর প্রসারী আকার ধারণ করেছে। ফলস্বরূপ, শুরু হয়েছে আগ্রাসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিশেষ কোন ক্ষেত্রের অধিকার কেড়ে নেওয়া, রাষ্ট্র ধ্বংস করা, ক্ষমতার আস্ফালন ও বিস্তার ইত্যাদি। এর ফলে জন্ম নিচ্ছে দ্বন্দ, নষ্ট হচ্ছে বন, চুরমার হচ্ছে সৃষ্টির কৃষ্টি, অতি স্বার্থপরতার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা অবাঞ্ছিত সব ঘটনা।

পুঁজিবাদ ঃ মানুষের এই বিজ্ঞানভিত্তিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ার সাথে সাথে প্রবেশ করেছে ভয়ঙ্কর পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী এই বৃহৎ জগতে প্রায় প্রতিটি দেশের মানুষ আজ দিশেহারা। কারণ পুঁজিবাদের ফলে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশ যেমন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন ইত্যাদি কর্পোরেট পুঁজির লালসায় অতি মুনাফার লোভে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই পুঁজিবাদের আকাশচুম্বী লোভে মত্ত প্রতিষ্ঠান বা প্রভুগন টাকা ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে, সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক শ্রেণি, মুনাফার জন্য বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করে ফাটকা খেলে যারা আমেরিকা তথা বিশ্বের ধনী দেশগুলির ট্রেজারী নিঃশেষিত করে ফেলেছে। এইসব প্রভুগণ, বাজার দেবতাকে পূজা করে। নিজেদের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য পুঁজিকে আঁকড়ে ধরে। লাগাম ছাড়া লোভের বশবর্তী হয়ে সুখ-ভোগ-বিলাসে আকৃষ্ট হয় আর সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করে না। এইভাবে আজকের বিশ্ব অর্থনীতি একটি ক্ষুদ্রগোষ্ঠীর স্বার্থ চরিতার্থ করে মাত্র। বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তারা পা বাড়াতে ভয় পায়, ফলে সাধারণ মানুষের জীবনধারনে

পরিবৃত্তের চাহিদাগুলি আজও বিশেষভাবে উপেক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে এর প্রতিবাদে ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১১ 'ওয়াল স্ট্রিট্ দখল করো'—এই অভিযান শুরু হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এবং ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়ে জার্মান, স্পেন, ইটালি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, হংকং এইভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে। এই প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১৫ই অক্টোবর '১১-তে এই বিক্ষোভ-বিদ্রোহে দেশে দেশে ঐকতান সৃষ্টি করেছে, 'পুঁজিবাদের দপ্তরে আঘাত হানো-দুনিয়ায় সব রাস্তা দখল করো। দুনিয়ায় শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষকে এক হওয়ার মূলমন্ত্র জুগিয়েছে জোরালো ভাবে। আবার আমরা যদি ভারতে আর্থ-সামাজিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে দেখা যাবে যে, ভারতের প্রায় ৭৮.২ শতাংশ মানুষ দিনে ২০ টাকার কম ব্যয় করতে পারে (অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির ২০০৪-০৫ এর রিপোর্ট অনুযায়ী)। ৬ কোটি শ্রমিকের মধ্যে প্রায় ৯৩ শতাংশ অ-প্রথাগত ক্ষেত্রে কাজ করে, মজুরি কম, সামাজিক নিরাপত্তা নেই বা অপ্রতুল। ১ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু মজুরের কাজ করে। ২ কোটি শিশু শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ পায়না বললেই চলে। অথচ সারা পৃথিবীতে ১ শতাংশ লোকের আয় নীচের দিকে ৫৭ শতাংশ লোকের আয়ের সমান। এটা অতি পুঁজিবাদের পরিণাম। পুঁজিবাদ কী ভয়ানক হতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ ঢাকুরিয়ার AMRI Hospital-এর আগুন লাগার ঘটনা। ৯ই ডিসেম্বর ২০১১-র এই মারণ খেলা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল তার নৃশংসতম রূপ।

মেরু করণ ঃ রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রেষারেষি, ক্ষমতা প্রদর্শন, আধিপত্য। আদর্শগত পার্থক্যের ফলে শুরু হয়েছে মেরুকরণ। সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ এই দুইয়ের সমন্বয় কখনো সম্ভব হয়নি। ফলে পুঁজিবাদের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে সমাজবাদীর সাম্যবাদের মনোভাবের প্রতিনিয়ত চলছে দ্বন্দ্ব। ফলে পৃথিবীব্যাপী মেরুকরণ স্পষ্ট হচ্ছে দিনে দিনে। ধর্ম-সংস্কৃতির বিপাকে পড়ে ও অনেক ক্ষেত্রে মেরুকরণ চলছে। এই অতি ক্ষতিকারক মেরু করণের ফলে তদানিন্তনকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সাম্যবাদী দেশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়েছিল পুঁজিবাদী দুনিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে। বর্তমানে মেরুকরণের চরিত্র পাল্টেছে। এক ধনী দেশ আর এক ধনী দেশকে উপেক্ষা করছে অথবা সমীহ করছে না ফলে শুরু হয়েছে পুঁজিবাদের পুঁজিবাদী মেরুকরণ। ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে চীনের নাম এই তালিকায় উঠে এসেছে। কালের অমোঘ নিয়মে যদি নিয়তি থাকে তবে আবার একটা বিশ্বযুদ্ধ হয়ত অবশ্যম্ভাবী বলে আমার ধারনা। ফলে মেরুকরণ এই মুহূর্তে পৃথিবীর কাছে একটা বড় জটিল সমস্যার জন্ম দিয়েছে।

মন্তব্য ঃ বর্ত্তমান বিশ্বের দরবারে প্রবেশ করেছে অনেক কালো ছায়া। এরমধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক ছায়াগুলি হল—পুঁজিবাদ, সন্ত্রাস ও আগ্রাসন। পুঁজিবাদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া খুব কঠিন। ব্যাপারটা এমন যে পুঁজিবাদ থেকে গোটা বিশ্বকে মুক্তি দেওয়া মানে ক্ষুধার্ত অজগরের মুখ থেকে জ্যান্ত আগ্রাসী খাদ্যকে ছিনিয়ে আনা। অজগর যেমন তার আহারকে সড়াৎ করে গলাধকরণ করে, পুঁজিবাদ ও তেমন গোটা বিশ্বকে গলধকরণ করে ফেলেছে। এর থেকে পরিত্রান পাওয়া বড়ই কঠোর এবং এর জন্য বিশাল শুভ বুদ্ধিশক্তির প্রয়োজন। বিশ্বের ধনী দেশগুলি দাদাগিরি করার জন্য নিজেদের অজান্তে অনেক সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাদের দুধ কলা খাইয়ে সাপের মতো বিষধর করে তুলেছে। ফলে বিষের ছোবল মারতে তারা সভ্যতার অনুপম সৃষ্টিকে যখন তখন ধ্বংস করার খেলায় মেতেছে। মনুষ্যত্ববোধ বিষের নেশায় নীলবর্ণ ধারণ করেছে, ফলে মানুষ মারতে ওদের হাত কাঁপে না। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না ওদের তাক্ করা বিধ্বংসী বুদ্ধির জোর। সন্ত্রাস দমন হয়ত করা যাবে কিন্তু নির্মূল করা যাবে কিনা এতে আমার সন্দেহ আছে। আগ্রাসন একটি ভয়ঙ্কর শব্দ ও বটে এবং এই আগ্রাসনের ফলে গোটা একটা রাষ্ট্র বিপন্ন হয়, ধ্বংস হয় স্থাপত্য, সৃষ্টি, অর্থনীতি। স্তব্ধ হয় উন্নয়ন। তথাকথিত ধনীদেশ এই আগ্রাসন নীতি যতদিন না বদলাবে ততদিন এই আগ্রাসন গোটা বিশ্বকে কুরে কুরে খাবে উঁই পোকার মতো। অবশেষে একদিন হয়ত বিশ্ব অর্ধ-গোলকে পরিণত হতে পারে।

চুল নিয়ে চুলোচুলি

শ্যামল

চুল নিয়ে আমাদের চিন্তা আমাদের সকলের। বিশেষত মহিলাদের। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সারা দেহে চুল আছে। মনে রাখা দরকার চুল বা লোম একই জিনিষ। আমরা বিশেষ কিছু অংশের লোমকে চুল বলি। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক লোম কী? লোমের গোড়া দেহের ত্বকের ভেতরে একটি লম্বা থলির মধ্যে থাকে। যাকে আমরা লোমকূপ বলে থাকি। লোমকূপের নিচে থাকে একগুচ্ছ সক্রিয় ও সজীব কোষ, যাকে বলা হয় হেয়ার ম্যাট্রিক্স। এই কোষের মধ্যে আরো কিছু আছে যাকে মেলানোসাইট বলা হয়।

চুলের জীবনধারায় তিনটি স্তর বা ধাপ আছে। বৃদ্ধির স্তর বা অ্যানাজেন, পরিমিতির স্তর বা ক্যাটাজেন ও স্থিতিবস্থা বা টেলোজেন। বৃদ্ধির স্তর বা অ্যানাজেনকালে হেয়ার ম্যাট্রিক্সের কোষগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে। এরফলে কোষগুলি ক্রমাগত লম্বা হয়ে ত্বকের বাইরে চলে আসে। যতদিন অ্যানাজেনকাল থাকে ততদিন চুল বৃদ্ধি হয়। এখানে জানিয়ে রাখি ট্রাইকো-কেরাটিন নামে এক প্রোটিন চুলকে শক্ত করে। লোমকূপে এক ধরনের কোষ থাকে, যা মেলানাসাইট নামে পরিচিত। এই কোষগুলির মধ্যে মেলানিন নাম প্রোটিন তৈরি হয়, যা চুলের কোষের মধ্যে ঢুকে যায়। মূলত এই মেলা নিনের জন্যই আমাদের দেশের চুলের রং কালো হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই প্রোটিনের কিছু হেরফেরের জন্যই কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের চুলের রং সোনালী হয়। সাদা নয় অর্থাৎ পাকা হওয়া। এর কারণ অন্য। সে সম্পর্কে পরে আসছি। একমাত্র অ্যানাজেনকালেই অর্থাৎ লোমকূপের ভিতরে চুলের নিম্নপ্রান্তের কিছু কোষ জীবন্ত। ক্যাটাজেন ও টেলাজেন স্তরের চুলের সব কোষই মৃত। তাই চুল কাটলে লাগে না।

কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে মৃত কোষেও পুষ্টি জোগানোর নানা কথা আমরা শুনে থাকি। টি ভি বিভিন্ন চ্যানেলে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে এইসব অবৈজ্ঞানিক প্রচার করা হয়। আর সবচেয়ে অদ্ভুত কথা হল এ বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয় সমাজের পড়াশুনাজানা অংশের মানুষ। মোটা টাকা খরচ করে তারা বিউটি পার্লারে যান চুলের পুষ্টি যোগাতে। গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে কিংবা বাঘকে দিয়ে ঘাস খাইয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো আমাদের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে কয়েক শ'কোটি টাকার তেল, শ্যাম্পু আরো কত কি বিক্রী করছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ প্রজাতির ডাক্তারবাবুরাও উপরি আয়ের জন্য আমাদের ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। তেল বা শ্যাম্পু নিয়ে আলোচনা এখন থাক। আগে জেনে নেওয়া যাক চুল সম্পর্কে আরো কিছু খুঁটিনাটি।

প্রতিটি চুলের জীবনধারা অর্থাৎ চুলের তিনটি স্তর একই সময়ে শুরু বা শেষ হয় না। যদি হতো তাহলে প্রত্যেকটা চুলের দৈর্ঘ্য সমান হতো, মানে একই হারে বৃদ্ধি পেত এবং পড়ে যেত। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেহের সর্বত্রই চুল বা লোম আছে। বিভিন্ন স্থানের চুল বা লোম বিভিন্ন দৈর্ঘ্যর। এর কারণ জেনেটিক বা বংশানু। আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ হরমোন নির্গত হয় তার ফলে একটা বয়সের পর আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে চুল বা লোম গজায়। এই জেনেটিক কারনেই আমাদের কারো চুল কোঁকড়ানো বা সোজা কিংবা পেচানো। চুলের স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্ভর করে দেহের স্বাস্থ্যর উপর। অর্থাৎ আমাদের দেহের পুষ্টি ও হরমোনগ্রন্থির কাজকর্ম ঠিক থাকলে চুলও ঠিক থাকলেও অপুষ্টিতে চুলের বৃদ্ধি আটকে যায়। সেই কারনে বড় কোন রোগ হলে আমাদের দেহের পুষ্টির অভাব ঘটে সেই সময় চুলের বৃদ্ধি আটকে যায়, অনেক ক্ষেত্রে চুল পড়েও যায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে আমাদের দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে চুল গজায়, যাকে আমরা প্রাপ্তবয়স্কের লক্ষণ হিসেবে গণ্য করি। অ্যান্ড্রোজেন নামক হরমোনের জন্যই এইসব স্থানে আমাদের দেহে লোম বৃদ্ধি ঘটে থাকে। পুরুষ দেহে এই হরমোনের পরিমান বেশি থাকে। আবার এই অ্যান্ড্রেজেন হরমোনের পরিমাণ অধিক হয়ে গেলে পুরুষ দেহে লোমের পরিমাণ বেশি হয় আর মাথার চুল কমে যায়—টাক পড়ে। আর নারীদেহেও এই হরমোন আছে কিন্তু তার প্রভাব ব্যালান্স হয়ে যায় তাদের ঋতু প্রক্রিয়ার জন্য। একটা বয়সের নারীদের রজোনিবৃত্তির কারনে দেহে অ্যান্ড্রোজেন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তখন বয়স্ক নারীদের দেহে (বিশেষত মুখ) লোমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মাথার চুল কমে যায়। আরো একটা ব্যাপার জেনে রাখি তা হল বিভিন্ন জাতি বা মানবগোষ্ঠির চুলের ও মেলানোসাইটের জন্য ভিন্ন নির্দিষ্ট বিশেষ বংশানু তাই আমরা বিভিন্ন জাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের চুল দেখতে পাই। একই কারনে আমাদের দেহে বিভিন্ন স্থানে চুল বা লোম এক একক রকমের। অর্থাৎ বংশানুজনিত কারনেই মাথার চুল লম্বা আর দেহের চুল লম্বা নয়।

এবার কিছু সমস্যার কথা ধরে এগোনো যাক সমাধানের পথে।

প্রথমেই আমরা, 'চুল পড়া'-র সমস্যার কথায় আমরা আগেই জেনেছি চুল বৃদ্ধির তিনটি স্তরের কথা। অ্যানাজেনের সময়কাল ৩ থেকে ১০ বছর। অর্থাৎ এই সময় পর্যন্ত আমাদের দেহের চুল বৃদ্ধি পায়। ক্যাটাজেন ও টেলোজেনের সময়কাল পড়ে ৩ সপ্তাহ ও ৩ মাস। এইখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে দেহের বিভিন্ন স্থানের ক্ষেত্রের এর তারতম্য ঘটে। সাধারণভাবে আমাদের মাথায় পড়ে ৩ লক্ষ চুল থাকে। কমবেশি ৩০ হাজার চুল টেলোজেন স্তরে থাকে। টেলোজেন স্তর কেটে গেলেই সেখানে অ্যানাজেন স্তর শুরু হয়। টেলোজেন স্তরে থাকা ৩০ হাজার চুল একদিনে পড়ে যায় না আবার অ্যানাজেন স্তরও শুরু হয় না। স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিদিন কিছু চুল পড়বেই আবার নতুন চুলও গজাবে। একদিনে ৫০টি চুল পড়ে গেলেও চিন্তা করার কোন কারণ নেই। চুল পড়া নিয়ে একটি তথ্য দেওয়া যাক। আমরা অনেক সময় শুনি বা বলি যে মাথার চুল পড়ে যাচ্ছে কারণ 'টাক পোকা' লেগেছে। অনেক সময় এটা লক্ষ্য করি যে অদ্ভুতভাবে মাথার একটা অংশে কিছুটা স্থানে চুল নেই, যেন টাক পড়েছে। এই ধরনের চুল পড়তে থাকাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় অ্যালাপোসিয়া বলে। এই অ্যালাপোসিয়া দুই ধরনের হয়, (এক) স্থায়ী - এক্ষেত্রে লোমকূপই নষ্ট হয়ে যায় ফলে নতুন চুল গজায় না। যাকে আমার টাক বলতে পারি আর (দুই) অস্থায়ী - এক্ষেত্রে লোমকূপ ঠিক থাকে, কোন কারণে কিছু সময়কালের জন্য সেখানে চুল গজায় না। মনে রাখবেন এক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসার প্রয়োজন। আর এই অ্যালাপোসিয়া কিন্তু শুধু মাথার নয় দেহের যে কোন স্থানে হতে পারে। টাকে (মানে স্থায়ী অ্যালাপোসিয়া) চুল গজানো স্রেফ ধাপ্পা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু গ্রাফটিং করে টাকে চুলের বাহার ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

এরপর খুস্কির কিস্‌সা। প্রথমেই জেনে নেওয়া যাক। যাদের সেবোরিয়া আছে বা যারা নিয়মিত তেল মাখেন তাদের মাথায় খুস্কি বেশি হয়। তেল লোমকূপের নালীমুখে ময়লার সাথে সেখানে জমা হয় এর সাথে মাথার মৃত স্খলিত কোষ মিশে খুস্কি তৈরি হয়। শ্যাম্পু বা সাবান ব্যবহার করে নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। অতিরিক্ত খুস্কির ফলে মাথায় জটিল ধরনের চর্মরোগ হতে পারে। মহিলাদের লম্বা চুলের জন্য তাদের সমস্যা বেশি। কারণ তাদের চুল শোকাতে সময় বেশি নেয়। দীর্ঘ সময় ধরে ভিজে থাকার দরুন লোমকূপের কোষগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে সমস্যা তৈরি হয়। এই ব্যাপারে মহিলাদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এইখানেই বলে রাখি চুল সেটিং প্রসঙ্গে দু-চার কথা। সাধারণত চুল সেটিং-এ চুলের কোন ক্ষতি হয় না। সাধারণভাবে থায়োগ্লাইকোলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। এতে চুলের কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু কোঁকড়া চুল সোজা করার জন্য প্রধান ফরমালিন বা পারমাঙ্গানেট ব্যবহার করা হয়। বেশি ব্যবহার করলে ক্ষতির আশংকা থাকে। নানারকম বাহারির জন্য খুব টেনে চুল বেঁধে চুল সেটিং করা হয়, এতে চুলের লোমকূপের উপর চাপ পড়ে। এরফলেও চুলের কিছুটা ক্ষতি হয়।

এবার পাকা চুলের পাঁচালী। পাকা চুলের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসবে সেই বিজ্ঞাপনের ডায়লগ, 'দিদি, পাকা চুল আই অ্যাম ফিনিশড্'। যাই হোক পাকা চুল কি? হেয়ার ম্যাট্রিক্সে মেলানাসাইটের পরিমাণ কমে গেলে বা তৈরি না হলে চুলের রং সাদা হয়ে যায়। আর এটাই পাকা চুল। পাকা চুল তুলে ফেললে সেই লোমকূপ থেকে আবার পাকা চুলই গড়াবে। পাকা চুলের কথা বলতে গেলেই একজনের কথা বলতেই হবে তিনি হলেন ইন্দিরা গান্ধী। আমরা সবাই দেখেছি উনার মাথার সামনের একগুচ্ছ চুল পাকা। এই পক্কতা প্রবীনতার জন্য নয়, বংশানুজনিত কারনে। অনেকেরই মাথায় এই ধরনের পক্কতা দেখা যায়। সেই স্থান মাথার যেকোন স্থানে হতে পারে। পাকা চুল কালো করার একমাত্র উপায় হল কলপ। অনেকেই বলেন অধিক চিন্তায় বা পেটের রোগের জন্য নাকি চুল পেকে যায়, এর কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি নেই। এখনতো অনেকেই শখে চুলে বিভিন্ন রং করছে।

আমরা সকলেই জানি এবং আগেই বলেছি যে চুল হল মৃত কোষের সমষ্টি। একে বলা হয় কেরাটিন, এ হল এক ধরনের প্রোটিন। চুলের গোড়া থাকে চামড়ার নীচে অর্থাৎ লোমকূপে। এর পুষ্টি যোগায় রক্তবাহী নালিকা। এর পাশেই রয়েছে সিবোসিয়াস নামে এক বহিঃক্ষরা গ্রন্থি। যা থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের তৈলাক্ত ধরনের পদার্থ। এই তৈলাক্ত পদার্থ চুলকে চকচকে ও নরম আমরা তাহলে আমরা বলতেই পারি চুলকে সজীব রাখার ব্যবস্থা আমাদের দেহেই আছে। চুলকে তেল দিয়ে আরো চকচকে করা হয় শুধু। চুলের পুষ্টি যোগায় না একথা জোরের সাথেই বলা যায়। উন্নত জীবের ক্ষেত্রে যে কোন কোষই খাদ্যগ্রহণ, পরিপাক বা বর্জন করতে পারে না। প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা কোষ আছে। চুলের গোড়ায় প্রোটিন ঢেলে দিলে চুল সেই প্রোটিন হজম করে নেবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। প্রোটিন বা ভিটামিনের অভাবে চুল পেকে যায় এমন কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে তেল বা শ্যাম্পু চুলের

প্রোটিন - ভিটামিন যোগাতে পারি। শ্যাম্পুর কাজ মাথার চুলের ময়লা সাফ করা। এই শ্যাম্পু থাকে মূলত ডিটারজেন্ট। যা দু রকমের (১) সাবান আর (২) সস্তার সিন্থেটিক পাউডার। এছাড়াও কিছু চর্বি জাতীয় পদার্থ। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা হয় শ্যাম্পুতে আছে ডিম, লেবু, প্রোটিন আরো কত কি। প্রথমে বলি ল্যানোলিনের কথায়। ভেড়ার লোম থেকে এই চবি পাওয়া যায়। এটি শ্যাম্পুর সাথে মেশানো হয়। দাবী করা হয় এই মাথার চামড়া থেকে যে অল্প পরিমাণ ফ্যাট চলে যায় তা ফিরিয়ে দেয়। কথাটা খানিক পরিমানে সত্যি হলেও কিন্তু শ্যাম্পুতে ল্যানলিন ২ শতাংশ বেশি মেশানো সম্ভব নয়। এবার ডিমের কথায় আসা যাক। এগ-শ্যাম্পুতে কতটা ডিম থাকে? এগ-শ্যাম্পুতে ডিমই থাকে না। এ কথা ঠিক যে ডিমের হলুদ অংশ চুলকে তৈলাক্ত বা চকচকে রাখতে পারে। কিন্তু তা গরম জলের সঙ্গে ফেটিয়ে লাগানো যায়। তাছাড়াও ডিমে যে প্রোটিন আছে চুলের ক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন নেই।

এছাড়াও আরো কত ধরনের শ্যাম্পুর কথা আমরা শুনি, যেমন ভেষজ। সেই প্রসঙ্গে সেই একই কথা বলতে হবে। তাই আর বেশি কিছু না বলে এখানেই শেষ করি। আর পরিশেষে বলি বিজ্ঞাপনের মহিমায় মোহিত না হয়ে যুক্তিবাদী মন গড়ে তুলুন।

The Importance of Communication

Ananya Chakraborty

Communication is an important facet of life. Communication skills are essential in all spheres of life, be it an interview or dealing with the project leader or working out a solution with a team or writing a report, precisely getting across the point effectively is what matters.

The success of an endeavour hinges on the ability to communicate effectively in today's fast paced life. In such a scenario effective communication holds the key. Effective communication centers round the usage of words, speed of delivery of words, pitch modulation and body language. Using the right tools to communicate the right messages at the right time can salvage crisis and motivate people to work towards success. In the existing globalization scenario, most of the Information Technology, I.T Enabled Services, Management Institutes, Public and Private Sectors, Multi-national Companies, Union Public Service Commission and State Public Service Commission are in search for right and suitable freshers for executive posts. Whatever be the recruiting criteria that I.T, ITES, Industry Giants have in their agenda, this is very clear that a first class degree will not serve the purpose, the candidates will have to satisfy the skill sets that the companies are looking for. And unanimously, the skill set that they are looking for is communication skills, followed by the rest.

People in organisations usually spend 75 percent of their daily time on communication through writing, reading, listening, speaking, inter-debate etc. Effective communication is an essential component for organisation success, whether it is the interpersonal, intra group organisation or external levels. A recent newspaper report said that out of every hundred interviews, only five may be qualified for employment. Being technically sound, they lack communication skills. Communication skills are as important as technical qualifications for youngsters aiming at a bright career. Communications hold the key. Poor communication skills, low confidence levels and improper body language have resulted out in the job race. The person recruited will have to deal with the global clients directly. The command over the language and accent neutralization also plays a vital role in the recruitment process.

Companies are functioning in a brutally competitive business world. One minor

mistake and it can cost companies millions of dollars and loss of loyal customer base. Organizations can do nothing to ward off the challengers. However, what they can do is to build up the communication skills of employees which play a significant role in retaining customer base, offer better service and make the customers visit them again and again. The fact is, customers have become very choosy on the subject of products and services. There is not much different between the quality of products and services offered by the companies in the same category. But they can definitely differentiate themselves on the basis of better customer service and effective communication. Communication works on two different levels of internal and external in an organization and both play an equally important part in deciding the future of the company.

What we need to remember here is that, a company is made up of people and to bind these people together in an organizational set-up, communication is a must. Right from business development to personal selling or marketing, communication plays a vital role in almost all the spheres of the business. Internal communication is crucial for managers to effectively convey the role and responsibilities to the employees and what is expected of them. The message must be understood clearly and then only workforce can function in a defined way. Internal communication is the key to increased employee productivity, high motivation levels and a feeling of mutual understanding within the company. Lack of effective communication can trigger a collapse for any organization.

If a business entity has to thrive in the market arena, it has to have a system of effective communication. This single most factor can provide an edge to the organization and makes it flexible to respond to the changes in the market without disruption of operations. Company that understands importance of communication also saves itself from wasted time, resources and man power.

Presence of effective communication system leads to productivity and helps in avoiding unnecessary delays in operations or implementation of a policy or transactions. Effective communication leads to a good style of management and that certainly augurs well for the future of the business organization.

Stay Hungry, Stay Foolish

Prasun Ray

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma–which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. Most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."

—Steven Paul Jobs (February 24, 1955–October 5, 2011)

Follow your heart. Such a simple message. Yet such a brave thing to do. People who do it usually have to fight a lonely battle, with the whole world. They have very few friends. They are ridiculed and made to suffer. But once they pass this litmus test, they achieve such levels of greatness that they literally move the whole earth, with the flow of their thoughts. They never die. They are immortalized through their ideas.

When I think of people who achieved this, the first name which pops to my mind are

Galileo and Nicholas Copernicus, who went against the all powerful church, and propounded that the earth revolves around the sun. They put their lives in danger, but did not abandon their beliefs. Now, whenever we think of sciences, astronomy in particular, they are considered as part of the foundation on which modern scientific thought was built.

We are fortunate to have witnessed the life and times of one such individual, during our lifetime, who lived the mantra throughout his life. He lived his whole life like a remarkable hero. His life was a collection of novel worthy stories : A remarkable childhood story, then a rags-to-riches story, then the story of his transformation from an innovator to a legend who transformed the way people interact with each other and the environment. It is a surprise that no one has made a movie on him yet.

I am referring to Steve Jobs, the founder of Apple, which heralded the personal computer. But that was just the beginning of how he transformed the information technology and communication industry. He transformed the way people listened to music, through the I-pod, transformed how people use their phones, through the I-phone, and then again transformed how people accessed information, through the I-pad.

But remembering him just for his technological revolutions will be like remembering Newton as just another scientist. Steve Jobs symbolizes much more. He has inspired a whole generation of dreamers to believe that the only thing standing between them and their dreams are they themselves. So, all they need to do is to apply some imagination to work around their own limitations and achieve what their heart is whispering in their ears to achieve.

He did this throughout his life. He was a child with foster parents, who used all their life savings to provide him a college education. But when he felt that college education was restrictive and of limited value, he dropped out and started taking classes which he felt interested in. This was not an idle whim. He fought hard to follow what his instincts told him to do. He slept on his college dormitory floor; collected bottle caps to pay for his meals, and would walk for miles once a week to have a decent meal at the local ISKCON temple. Whatever he learnt during that period, he soaked it up like sponge and used his knowledge later in his inventions. For example, he took a calligraphy course which he used later to develop the fonts for his invention, the Apple Computer. As a result, any word processing software nowadays has a wide range of fonts, without which, all our presentations and documents will be just bland text.

Following your heart is off course not easy. You become the sworn enemy of people who remain content with the status quo and get irritated with your stubbornness to fight against conventions. Something similar happened with Steve. In 1985, due to creative differences with other senior executives, he was thrown out of the very company he founded. But the strength of the heart-followers lies in their courage of conviction; their belief that any steback, however major, is just temporary, and what their instinct is telling them, is bound to happen, if they persevere. He used this opportunity to start afresh and build his initial ideas around information sharing and communication. Before long, he was back at the helm of Apple and embarked on the most productive period of his life which witnessed the birth of the I-pod, the I-phone and the I-pad, all products which are not only redefining how people use technology, but also leading to the birth of new industries.

This was just a snapshot on the life of Steve Jobs, to show his significance not only as an innovator, but also as an inspiration for us to remember that any dream we may be having, however outlandish and unachievable it may seem, is actually achievable. All we need to do is be sincere and committed towards achieving that dream. Almost all of us are very sincere towards our jobs, our studies and our domestic duties. But how many of us are committed towards achieving our aspirations? Let us all try to correct this anomaly. As we remember Steve Jobs, let us all try to awaken the Steve Jobs in our heart.

Real Myth

Aritra Bhattacharya

The title may draw some yawn as we are used to live in an age which is quite contrary to those apparently useless word-'Myth'. But I humbly like to draw the attention of many people about how our so called real and practical life is built around and nourished by some myths. Those have mingled in our life so intently that we hardly cast an eye on them. By definition myths are the heredetory stories of ancient origins which were once believed to be true by a particular cultural group. They explained many mysterious and supernatural stories of the world in their own way. Some of them become legends and some found themselves in popular folklore.

Now, after this definition of the outdated story, I like to focus upon a lullaby.

'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কীসে?'

We all used to sleep cosily hearing this rlythemic lore in the voice of our mom or gramny. But have we ever noticed the real horrors of foreign invasion and zamindari torture used to made us asleep! Thus from the very childhood we are made to listen the real history of Bengal and its people through their folklorish lullaby. I want to mention another very common legend of Golden Deer from 'The Ramayana'. Our very own Rama there chased the Golden Deer to make his beautiful wife happy. But ironically this search for happiness ultimately brought all the miseries of his life. Don't we also, in this real life of 2011 chase after something which is not our own? Which allures us of many happiness but finally destroys our little happy life?

Now look at the greatest festival of Bengali people—Durga Puja. In this puja we celebrate the legend of Devi Durga and her poweress—Godden Durga Kills Ashura with her...or is it actually her? No, she kills the demon with her husband's Trishula. In the mood of festivity we often forget that Devi Durga was created from the 'Tejas' of three male Gods. They were Gods who created her and Gods who murdered the evil by using the lady figure only as a glorified medium. Does this shrewd patriarchy match with our very modern 21st contury world where the voice of feminism is growing louder everyday? I think I will get a secret nod from every reader.

Now a days we all are very aware about our constantly decreasing surrounding—terrorism, corruption, evil politics, pollution and so on. But still we continue our life—with the hope that someday somebody will end it all. We hope for a better future even unconsciously every morning. But have we ever, any of us any abolition of real evil and improvement of situation in our life time? No. Then, what gives us this life spirit, mental strength? It is myth. The very myth of killing the evil by the good is enscripted not only in Hindu mythology but in every culture—be it christ, be it Muhammad or be it Beownlf. This innate ancestral belief upon myths keeps us alive amidst all these hurly-burly. So the purpose of myth does not end with the advancement of science and technology, rather it increases all the more. It helps human being to cope with the changing reality by changing itself constantly. So it is not that bad to stop and stare at our own past, our culture and myth for some time. It creates and moulds and even warns us about every basic human emotion even in the day of opening one of the fastest tracks of the world in Noida.

SMILE AS A LYRICAL EVALUATION.....:

Souravi Chatterjee

The charisma of lips
The beauty of cheeks
A cute smile on the face
Gives the warmth of comfort to the next
The purpose of smile
To remove the rotten from cycle of time
The nicety of a smile
Is the blessing of Divine
The fragrance of flower
Petals of various colors
Smile in the interview
Adds a charming persona to you

Smile is the outcome of our happy reflections and satisfactions in different perspectives of our lives.We have a mental cognition that we can do we can achieve in life.The wholesome confidence of our potential gets galvanized through a small smile, which is a pre requisite of our nomenclature of success.

The age of smile
Is above all & infinite
Smile is not fragile
Smile is not futile
Ma's blessing brings smile
The taste of success grows bright
Romance without a smile
Is of no use & style
The smile of a child
The beauty of twilight
Lives in the virtuous GOD
And in his Heavenly snowfall

Smile is the heart of optimism. It is a symbol of not only our success but also our acceptance about others loving and faith in our smile. Smile is the return gift (although explicitly just a nominal one) to the Heavenly Almighty

to say him that we are grateful to HIM for sending us on earth. It is a thing which need not to be learnt as a new born baby can also smile with their unknown reflex action as soon as they see our smiling gestures.:

Smile when a waiter gets a tip
Smile when a woman gets to teach
Smile while giving a gift
Smile while receiving a treat
Smile when a student gets an admission
Smile when an aged gets his pension
Smile when a soldier comes to home
Smile when a couple goes to Rome

Smile gets embellished without any kind of preparations or grooming. It doesn't gets abide d by the principle of decorum .It lacks the scale of measurement because the only Richter Scale of smile is A Smile itself .

The failures & shattered dreams
Melts the smile like an Ice Cream
The corruption & violence ruptures smile
But still it doesn't gets banished by
endless crimes

The corruption is a known fact which has ruined the smile many a times but still a smile gets up & gets exposed. There are many reasons behind our tears but a smile doesn't needs a reason always because it knows to work selflessly also.

Thus it may rightly be comprehended as
A TREATY TO BRING PEACE
TO END A FEUD OF RISK
A CATEGORICAL IMPLICATION
WITH A JOVIAL EQUATION

The Impact of Social & Environmental Crisis on Women in North East India

(*With Special Reference to Meghalaya*)

Dr. (Mrs) Manjari De

The North East of India constitutes the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Magalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura. The region is of strategic importance for the country on account of the fact that nearly 90% of regional borders form India's international boundaries.

Flanked by the hills and with mighty Brahmaputra River slashing a central path between the north and south, North East is bounded by the states of Manipur, Maghalaya, Mizorum, Nagaland,Tripura with Assam comprising the heart. Arunachal Pradesh lies in the direction of its north and Sikkim a little away in the North West bordering China and Bhutan, Bangladesh and Myanmer lie to its southwest and east.. The eight states that comprise the region reflect ecological and cultural contrasts between the hills and the plains.

The North East region is one of the most bio-diverse regions in the world. It is the land of rising sun in the sub-continent. The area can be divided into three geographical divisions- the Shillong Plateau, the North Eastern Hill Basin and the Brahmaputra Valley.

Meghalaya is quite rich in natural resources like coal, uranium and is the only state with surplus power generation. It is also known for the tourism potential. Its climate is not only ideal for the development of tourist and health resorts but also for the growth of a large number of horticultural crops.

Meghalaya is blessed with tropical, semitropical and temperate climates. The variation of altitude, soil and climate conditions provide ample scope for the cultivation of a wide variety of horticultural crops. The agro-climate conditions in Maghalayla favours the cultivation of vegetables throughout the year. The area of the state is 22429 sq. km with 5 districts. Population is predominantly rural.

The major chunks of population belong to the scheduled tribes. Half of the population are living below the poverty line. The society of Meghalaya has a Powerful matrilineal history. But at present the panorama of the society shows that it is a myth. Case study shows that at the age of 25 a female resident of Meghalaya is the mother of 10 children with eldest being a little over 10 years of age. That lady has no clue about how to prevent another pregnancy. Her husband also feels that having babies and looking after them is a women's job. Though the matrilineal society been a source of great pride to the state but the ground reality is quite different (Source- India Together, April 2002)

In some ways the condition of matrilineal women could be even more precarious than that of their position in patriarchal societies. A significant reason for this has to do with the fact that these women experience could be called double negative effect. The universal discrimination experienced by all women to which is added the burden of living under the assumption that women controls everything. This in turn is taken to mean that these women do not need any special attention to ensure their rights.

Besides vulnerability of domestic violence, political rights are another sphere where women are not empowered in this state. While women in the rest of the country have got the right of 33 per cent representation in the panchayats(local self government), women in Meghalaya have only recently woken up to the need to seek representation in such middle-

level political institutions but we can say that women in Meghalaya are nowhere. They neither become tribal nor village chiefs. They do not even have the right to elect candidates to these posts.

The general health condition of the women is poor. Significant portion of women do not receive any antenatal/ post-natal care and a large number of deliveries are conducted by untrained birth attendants or relatives. Due to lack of potable water diarrhoeal diseases poses a major problem to the population. Asthma, Tuberculosis, Jaundice and Malaria are most common in north eastern states. The consumption of milk is important nutrition for women's health whereas in Meghalaya only 23.7% women consume milk or curd which is much below the national average. More than ¼ of women suffer from moderate to severe anaemia in Meghalaya. 94.9% of women did not receive any home visit by a health worker or family planning worker.

Meghalaya should have been the role model for gender equality, but despite the strong matrilineal traditions, the status of women is among the lowest in the country. Cross-country study on the status of women in comparison, it was highly patriarchal state like conflict-ridden Manipur that ranked the top of the gender index. According to Dr. Bloris Lyndem, a women's rights activist and well known educationist, who got Sardar Vallabhbhai Patel National Award for promoting literacy, "Rural life in Meghalaya is marked by poverty and which have a fallout on women in the form of domestic violence and deserted wives and children" She points out that the status of women is the complete silence around these issues.(source-India Together, April 2002) It is true that women in Meghalaya have more mobility, but custom and practices of the community no way allow women the social space to participate in decision making. Women are indeed lagging behind in social, economic and political sphere.

Women in matrilineal societies are entrusted with enormous rights over property and in Meghalaya the actual ownership of property is not theirs. They have no right in performing the family rites. According to O D Vallentine Ladia, a state lawyer, women do not have the right to dispose off property, even women can not claim maintenance if deserted by their husbands as they do not have this right in their matrilineal customary practice. According to Linda "women are losing out faster" (source-India Together, April 2002). The state has to make up urgently for the special development needs of women. 'In Meghalaya matrilineal societies are deteriorating the fastest.'

Another serious concern has been raised over the detection of a high percentage of arsenic in the underground water found in certain part of North-Eastern region of India which is hazardous not only to the health of all living creatures but also to the environment. Arsenic contamination in ground water is a problem of global dimension.

New survey reveals that people in 17 countries around the world are at serious risk

Arsenic is a semi-metallic element occurring naturally and abundantly throughout the earth. It commonly surfaces by natural processes and often has a negligible presence in water, but can also be exposed in devastating amounts both naturally and due to human industry, typically agricultural, irrigation or mining. However exposed, arsenic poisoning in drinking water has led to a health crisis in third world countries such as Bangladesh, and also threatens affluent nations like the United States.

When arsenic is consumed in small amounts for a long time it can lead to a slow death or other illness. Arsenic poisoning dose cause a variety of systematic problems.. Typical symptoms are diaphoresis, muscle spasms, nausea, vomiting, abdominal pain, garlic odour to the breath, diarrhoea, dehydration, hypotension, cardiovascular collapse, Blackfoot's disease, acute anaemia and death.

In our India Arsenic invaded the Ganges valley all the way to the Himalayas, an area that is home to half a billion people The new focus of concern is the northern India state of Bihar(pop.83 million) In northern India,80% of the population drink groundwater from tube wells, most of which have never been tested for arsenic .A survey of 3000 tube wells completed in Aug 2003 by the Jadavpur University, Kolkata, found that arsenic levels in 40% of them exceed the WHO limit and 12 contain water at more than 20 times the limit. More than half of the adults examined show symptoms of arsenic poisoning The North Eastern region of India also severely affected by arsenic laced ground water.

The matter came to light during a survey of the underground water found in the North-East region by an organisation named Neriwalam in 2003-04.During the survey the said organisation collected 1500 samples from Assam, 296 samples from Arunachal Pradesh, 182 from Meghalaya, 132 from Nagaland, 128 from Sikkim, 117 from Tripura, 114 from Mizoram and 60 samples from Manipur. (The Sangai Express-8th January, 05)

According to the specification laid down by the World Health Organisation, if the arsenic content in underground water reaches 50 ppb, then it is unsafe for human consumption and can be hazardous to the environment as well, said the source. The United States Resources Centre had also laid down a similar specification. According to the survey of Neriwalam, the arsenic content of the underground water found in Assam, Manipur Sikkim, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Tripura and Mizoram at 300 ppb while in Nagaland it was 50ppb.

Arsenic hazard is not only a physical but also a social phenomena, the social fallout of arsenicosis is enormous. The arsenic hazard has a strong social dimension, affecting issues such as relationship within the family and the village, as well as the mental health of the sick. Dr. Mahbuba Nasreen from the Department of Sociology, University of Dhaka, observed the social costs of arsenic contamination in the following forms: Social instability, superstition, ostracism, marital problems, discrimination against women, increased poverty, diminished working ability and death. (source-Arsenic Contamination in Bangladesh-Dhaka: ITN Bangladesh 2002)

Social problems arising from the arsenic crisis has a great impact on women. Women perform a bulk of the domestic work but their role in society has long been underestimated and their work undervalued. Within the domestic sphere, almost universally we find a clear-cut gender-based bias against women. As domestic water manager, women are expected to play a significant role in several capacities: as selectors of water source, as carriers of water, as caretakers of water, needs of infants and children, and the like. This multi-faceted role of women, particularly in rural settings, has been a cause of significant concern, on both national and international fronts. The lives of women are shaped by the prevailing gender ideology and revolve around being daughters, wives and mothers first. In hilly areas most of the domestic services are delivered by women while 1% is delivered by men. Women are also working in the agricultural field. So they are frequent victims of ostracism due to arsenicosis.

At present discrimination against female arsenic patient is a burning problem, especially in rural area. Health concerns include great risk of arsenicosis in women due to higher rates of malnutrition in females. Women exposed to arsenic contamination are at greater risk of spontaneous abortions and stillbirths, (WHO, 2000)

Arsenic has an adverse impact on women as per marital relationship. People are reluctant to develop marital relationship with those families whose members suffer from aranicosis. This has caused serious anxiety for parents of unmarried adult children. Many women are divorced or abandoned by their husbands due to arsenicosis. Because of

socio cultural restrictions, women often do not receive opportunities to obtain information from outside sources .Thus they are not properly aware of the danger of arsenic. It is difficult to arrange marriage for a young girl affected by arsenic; housewives are divorced or forcibly sent to their paternal house with children.

As the arsenic laced water rings out the alarm bell in Maghalaya, the government ought to look into the matter seriously. According to Professor P. Kumar (Manipur University) 'arsenic can be removed from underground water by a series of treatment technology. Know-how or how to treat the arsenic laced water is of utmost importance.

According to Professor B. Manihar Sharma 'it is best not to use the underground water'.(source The Sangai Express- 8th January 05). Mitigation activists and policy makers require information about gender issues in developing sustainable water resources. Given prevalent gender ideology, steps must be taken to ensure effective communication with more frequent users of water, women. For the awareness of the society we should make 'Human right movement'. Human right issues appeal to the core of human compassion. However, in many cases, compassion alone can not alleviate the injustice of the society. The success of human rights solution depends on constraints presented by reality.

Most of the people in Meghalaya are tribal people. So, in order to improve the condition of women in this region, we should design our plan of action in such a way for each specific tribal group that cater to their specific needs and problems by ensuring their personal involvement.

References:

1. The Report of Asia Arsenic Network 2003.

2. India Together, April 2002.

3. Mahbuba Nasreen,"Social Impact of arsenic", 2002(Dhaka IIN Bangladesh)

4. The Report of the 3rd International Conference on Water Resources and Environmental Research 22-25 July 2002.

5. The Telegraph Weekly, 24 March 2004.

6. The Report on Arsenic in Drinking Water- WHO 2005.

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০
নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা'

স্থায়ী বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ন একটি বিকল্প

● কারিগরী ক্ষেত্রে জীবনভর অবিরাম শিক্ষা কি সম্ভব?—*প্রণব রায়*

অনেক সময় আমরা যখন কোনো এক জন শ্রমিকের কর্ম কুশলতার মুল্যায়ন করতে যাই, তখন আমরা সেই শ্রমিকটি কোন শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই শিল্পটি সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কিনা তাই মূল বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলতঃ যে সব শ্রমিক কর্মকুশল, কিন্তু পুরানো প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে কাজ করছেন, তারা অনেক সময়ই নিজেদের দক্ষতার দাম পান না। আমাদের প্রদেশে বিশেষ করে এই সমস্যা খুবই প্রবল। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত এবং তাদের মজুরী এবং সামাজিক অবস্থান ছিল ঈর্ষনীয়। কিন্তু আজকে অন্যান্য প্রদেশের শ্রমিকরা স্রেফ নূতন নূতন প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে কাজ করছেন বলে দক্ষতা ও রোজগারের নিরীখে অনেক আগে এগিয়ে গেছেন। অবশ্য এই পরিবর্তন অনেক সময় হিতে বিপরীত ও হয়ে উঠতে পারে, যেমনটি দেখা যাচ্ছ মারুতী সুজুকী কোম্পানীর মানসের কারখানায়। কিন্তু সেটা বিষয়ান্তর এবং আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

বিগত কয়েক দশকে সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে নূতন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি বেড়ে গেছে অনেক গুণ। প্রত্যেকটি শিল্পক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় উৎপন্ন বস্তুর গুণমানের (quality) অনেক উন্নতি হয়েছে এবং উৎপাদন ক্ষমতাও (productivity) বেড়ে গেছে কয়েক গুণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আজ হাত ধরা ধরি করে এমন ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং শিল্পক্ষেত্রকে এমন ভাবে প্রভাবিত করছে, যা কয়েক দশক আগে তথাকথিত উন্নত দেশগুলিতেও ছিল অকল্পনীয়। গত পঞ্চাশ বছরে যত যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে, তার আগের দু'শ বছরে তার অর্ধেকও হয়েছে কিনা সন্দেহ। সবচেয়ে বড় কথা হলো কোন আবিষ্কারের সামান্য কিছু দিন পরেই সেই আবিষ্কারের ফসল আমরা বানিজ্যিক ভাবে বাজারে ক্রয় করতে পারি। অর্থাৎ কোন আবিষ্কার ও তার বানিজ্যিক বিপননের মধ্যে সময়ের সীমাভেদ অনেক কমে গেছে। আমার মনে আছে মাত্র সেদিন ১৯৮৯ সালে আমি কম্পিউটারের একটি ট্রেনিং নিয়েছিলাম, শিখেছিলাম ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার, আজকে যা অচল। কয়েক দিন আগে যখন খবরের কাগজে পড়লাম, উত্তর কোরিয়ায় এখনও ফ্লপি ডিস্কের ব্যবহার চালু আছে তখন সত্যি অবাক হলাম।

এই যখন 'হাল হকীকৎ' অর্থাৎ বাজারে আসার বছর কুড়ির মধ্যেই যখন কোন নবাষ্কৃত বিস্ময় সোজা বাতিলের দলে পৌঁছে যায়, তখন এই সব নূতন নূতন প্রযুক্তির সাথে সাথে তাল মিলিয়ে পুরানো প্রযুক্তিতে কাজ করে অভ্যস্থ কর্মীদের নূতন প্রযুক্তিতে শিক্ষিত করা এক দুরুহ ব্যাপার। আজ যে ভদ্রলোক সবচেয়ে কর্মদক্ষ বলে বিবেচিত কাল নুতন প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সাথে তিনি কোম্পানীর বোঝা হয়ে উঠতে পারেন। আমরা জানি আমাদের দেশের পুরানো ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার অচলায়তনে সিলেবাসের বা শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন এক কঠিন সমস্যা। এখন ও পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদানের অর্থ হলো শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ভাবে বুনিয়াদী বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রতিপাদ্যগুলি একটি মান্ধাতার আমলের সিলেবাস কে অনুসরণ করে যেন তেন প্রকারেন গলাধঃকরন করিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডী পার করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কর্মজীবনের ঘাটে ঘাটে শিক্ষার্থীরা দায়ে পড়ে (সোজা কথায় চাকরী বাঁচানোর অথবা চাকরীতে উন্নতি করবার তাগিদে) নূতন নূতন প্রযুক্তিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোম্পানীর মালিকের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া যায়, তিনি সময় দেন শেখবার জন্য এবং আর্থিক সহায়তাও করেন, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না শিখতে পারলে জোটে গলা ধাক্কা। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবার দেখা যায়, অনেক লোক এমন থাকেন যারা শেখার কষ্ট না করেও দিব্যি সময় মতো প্রমোশন পেয়ে যান, ফল স্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির মাথায় এমন সব লোক পদ অলংকৃত করে বসে থাকেন যাদের যোগ্যতাই নেই নুতন প্রযুক্তির ভালো মন্দ বিচার করার। তাদের সব সময় একটা সবজান্তার মুখোশ পড়ে থাকতে হয় এবং অপেক্ষাকৃত নবীনদের উপর হম্বী তম্বী করেন, কারন নুতন কিছু গায়ে গতরে শেখাটাকে যে তারা অসম্মানের মনে করেন। এই ভাবে কিছুটা চলতে পারা যায় না যে তা নয়, কারণ বেশিরভাগ নব্য প্রযুক্তি পুরোনো প্রযুক্তিগুলির বুনিয়াদের উপরই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সমস্যা হয় যখন কোনো প্রযুক্তি সম্পূর্ণ নুতন এবং এখনো পর্যন্ত অজানা বৈজ্ঞানিক প্রতিপাদ্যর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে।

তখন বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা হয়ে যায় খুব কঠিন। মোদ্দা কথা হলো প্রযুক্তি ও মেশিন যেমন কিছু দিনের মধ্যে বাতিলের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, এক জন মানুষেরও একই দশা হতে পারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত নক্ষত্র হলেও। এখন একটা কথা খুব চালু আছে, প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিকদের অর্ধজীবন (half-life)। আমরা জানি একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ আছে অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তার তেজস্ক্রিয়তার দ্রুত পতন ঘটে। একজন প্রযুক্তিবিদের ও মূল্য ও উপযোগিতা অতি দ্রুত পতনশীল হবে, যদি না তিনি সময়মতো নিজেকে তৈরি করে ভবিতব্যকে ঠেকানোর চেষ্টা করে। একটি উদাহরণ দিলে বোধহয় ভালো হয়। সত্তরের দশক পর্যন্ত বিজ্ঞান শাখার সেইসব ছাত্র জীববিজ্ঞান পড়তেন যারা অঙ্কতে অপেক্ষাকৃত কাঁচা, কিন্তু আজ জীববিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান পূর্ণ হবে না যদি না আণবিক স্তরে মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর অতি জটিল কোষ বিভাগ ও বিবর্তন বিষয়ে জানা না থাকে, আর তা জানতে হলে মানব শরীর ও অন্য জীবজন্তুর শারীরিক গঠনের প্রযুক্তিগত বিষয়ে জানতে হবে, তাছাড়া তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞানও থাকা দরকার। আজ থেকে ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে জীববিজ্ঞানের কোন বিষয়ে একজন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে এসব না জানলেও চলত। কিন্তু এখন একজন জীববৈজ্ঞানিকের যদি তথ্য প্রযুক্তির সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তাকে অর্ধশিক্ষিত বলে গন্য করা হবে এবং তিনি বাতিলদের দল ভারী করবেন।

অর্থনৈতিক উদারিকরণ, বিশ্বব্যপী গুনমান উন্নয়নের প্রতিযোগিতা ও দেশীয় বাজারকে বাঁচিয়ে রাখার সরকারী ছাতার অপসারন প্রযুক্তিবিদদের সমস্যাকে আরো গভীর করে দিয়েছে। প্রযুক্তিবিদকে তাই আজ নিজের কর্মজীবনকে বিশ্বের বাজারে বাঁচিয়ে রাখতে হলে নিজের জ্ঞান ভান্ডার ও দক্ষতাকে সদাবহতা নদীর মত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো কারিগরী ক্ষেত্রে জীবনভর অবিরাম শিক্ষা কি সম্ভব?

অবিরাম শিক্ষার মানে এক একজনের জন্য এক একরকম। তবে তিন রকমের শিক্ষাকে অবিরাম শিক্ষার অন্তর্গত ভাবা যেতে পারে, যথা,—

(ক) যে সমস্ত বস্তু হাতের কাছে আছে তার থেকেই শিক্ষা লাভ। কেউ যদি কোন একটি জায়গায় কাজ করে, যেখানে তথাকথিত পুরানো প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হলে সেই প্রযুক্তির ভালোমন্দ সবকিছু অনুধাবন করা ও সেই প্রযুক্তিটির প্রধান শক্তি ও দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা।

(খ) যে সব মানুষের সংস্পর্শে আসা যায় তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা (সহকর্মী বা নিম্নবর্গের কর্মী অথবা অফিসের বস হতে পারেন, পেশাদার শিক্ষক ও হতে পারেন)।

(গ) জ্ঞানের ভান্ডার পর পর থরে থরে যদি এমন ভাবে সাজানো থাকে যে একজন শিখতে চাইলে একটি পরিচ্ছেদের পর আরেকটি পরিচ্ছেদে সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় আসে পাশের লোকজনদের সহায়তা ছাড়াই।

কারিগরী ক্ষেত্রে আজীবন অবিরাম শিক্ষা বলতে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করাটাই বড় কথা নয়, একজন মানুষের সার্বিক উন্নতিও খুবই প্রয়োজন। একজন প্রযুক্তিবিদকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয় না যে সে নিজের খুশিমত কোন নতুন জিনিস শিখবে। বরং অবিরাম শিক্ষা পদ্ধতিটা এমন হবে যে একজন প্রযুক্তিবিদ শত বাধা সত্ত্বেও শিক্ষা পদ্ধতির নিয়ম বাধা গতে নিজেকে ডুবিয়ে দেবে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের দেশের অবিরাম শিক্ষা ব্যবস্থার পটচিত্রটি দেখা যাক। কর্মরত প্রযুক্তিবিদদের আমরা যেসব সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে দিয়ে থাকি তা হল যথাক্রমেঃ—

—অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কারিগরী বিভাগের কর্মীদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে থাকেন কিন্তু এই শিক্ষাদান সাধারণতঃ নবীন কর্মীদেরই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, তা'ও খুব কম সংস্থাতে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষকেরও বড়ই অভাব দেখা যায়। সার্বজনীকে সংস্থাগুলিতে যা'ও বা কিছু ব্যবস্থা আছে, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেই ব্যবস্থাও নেই।

—কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে অবিরাম শিক্ষার নামে কিছু কিছু স্বল্পকালীন সময়ের শিক্ষাক্রম চালানো হয়। এই শিক্ষাক্রমগুলির উদ্দেশ্য অনেক বড় বড় থাকে কিন্তু উপযুক্ত ফলপূরণে ব্যর্থ হয়। যারা শিখতে আসেন তাদের শেখার আগ্রহটাও অনেক ক্ষেত্রে কম থাকে, অনেকেই সবেতন ছুটি কাটানোর মনোবৃত্তি নিয়ে আসেন, এবং অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন হওয়ার জন্য এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও কোন দায় থাকে না শিক্ষার্থী কেমন শিখল তা জানার। শিক্ষাক্রমটি শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীর কতখানি কাজে লাগলো কি না লাগলো তা জানার কোন ব্যবস্থা

আদৌ থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা কোনরকম নির্দিষ্ট দিশা না থাকার জন্য এই শিক্ষাক্রম গুলোকে অবিরাম শিক্ষার পর্যায়ে ফেলা হলেও, আসল কাজের কাজ কিছু হয় না। আমার মনে আছে অনেক বছর আগে আমি এরকম একটা শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলাম আমাদের দেশের নামে ডাকে উচ্চতম কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিষয় বস্তু ছিল Short Term Course on Creep resistant materials and Fibre reinforced plastics। এখন যারা জানেন তারা বুঝতেই পারছেন এই দুইটি বিষয় বস্তুর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু মাননীয় অধ্যাপক মহাশয়ের বোধ হয় একটি Short Term Course আয়োজন করা দরকার ছিল নিজের প্রমোশন পাওয়ার জন্য। আমরা যারা শিক্ষার্থী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলাম আমাদেরও শেখার আগ্রহ যে বিশেষ ছিল তা বললে সত্যের অপলাপই হবে।

—একই ভাবে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মেটালস, ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারসের মতো বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক শিক্ষাক্রম চালান যেগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে সার্টিফিকেট পেতে পারেন, কিন্তু সার্টিফিকেট লাভের পর শিক্ষার্থীদের সাথে এদের আর কোন যোগাযোগ থাকে না এবং অনুসরণকারী কোন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পূর্ণ অভিষ্ঠ লাভ হয় না।

আমাদের প্রতিবেশী চীন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে যদি আমরা শিক্ষা নিই তাহলে বোধহয় একটা দিশা পাওয়া যেতে পারে। চীন দেশের অভিজ্ঞতা হল,

—অবিরাম শিক্ষাকে কাজের একটি অংশ হিসাবে ধরে নিতে হবে, সর্বশ্রেণীর সব প্রযুক্তিবিদকেই প্রত্যেক বছর বাধ্যতামূলকভাবে নতুন জ্ঞান আহরণ করতে হবে এবং নিজের প্রযুক্তির বাইরে অন্য কোন প্রযুক্তির খুটিনাটি শিখতে হবে ফলতঃ, প্রযুক্তিবিদদের পূর্ব কথিত হাফ লাইফ অনেক বেড়ে যাবে এবং কোনদিনই বাতিলের পর্যায়ে পড়ে যাবে না। বছরের শেষে কর্মীর মূল্যায়ণ নির্ভর করবে তার শিক্ষাগ্রহণ ক্ষমতার উপরে।

—যারা কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তিগত শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের ও প্রথাগত শিক্ষার বাইরে অবিরাম শিক্ষার অংশ হিসাবে কোন সহযোগী বিষয়ে শিক্ষা নিতে হয়। প্রথাগত শিক্ষার ও অবিরাম শিক্ষার সংযোগে তৈরী হয় একজন পূর্ণ প্রযুক্তিবিদ যার হাফ লাইফ অনেক বেশী এবং কোন প্রতিকূল অবস্থাতে তাকে কেউ বাতিলের দলে ফেলতে পারবে না।

—শিল্পজগতের নেতৃবৃন্দ অবিরাম শিক্ষাকে চীন দেশে একটি বিশেষ স্থান দিয়ে থাকেন এবং সেখানকার উৎপাদকতার উন্নয়ন তারা মনে করেন অবিরাম শিক্ষার একটি সুফল।

অনেক কেষ্ট বিষ্টু নিশ্চয়ই এই সব বিষয় নিয়ে ভাবছেন, আমার মত হরিদাস পাল নুতন কিছু হয়তো লিখতে পারি নি, তবে উপরোক্ত আলোচনার নিরীখে কারিগরী ক্ষেত্রে অবিরাম শিক্ষার ধারা বজায় রাখা এবং অবিরাম শিক্ষার সুফল পাওয়ার জন্য কিছু কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন আমি মনে করি। যথা—

—যে কোন শিক্ষাক্রম শুরু করার আগে প্রথমেই জানতে হবে শিক্ষাক্রমটি যে বিষয়ের উপর সেই বিষয়ে শিক্ষাদানের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা। যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে বিষয় বস্তু কি ভাবে সাজাতে হবে এবং হাতে কলমে কাজ শেখানোর সুযোগ থাকলে যতখানি সম্ভব সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই ব্যাপারে শিল্পসংস্থাগুলির সহায়তা নিতে হবে। বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গুলি (professional bodies)র সাথে যোগাযোগ করাও দরকার। কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজকাল Industry Institute Partnership Cell নামে একটি বিভাগ থাকে—আমাদের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই বিভাগটি থাকে নিতান্তই একটি অলংকার হিসাবে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে অর্থ ধার করে একটি প্রকল্প চালানো হয়েছিল যার নাম TEQIP (Technical Education Quality Improvement Programme)। এই প্রকল্পে অন্যান্য অনেক কিছু কার্যক্রমের সাথে সাথে শিল্পের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেল বন্ধন ঘটানোরও একটি প্রচেষ্টা ছিল। সমাজের প্রতি কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা হিসেবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরী ক্ষেত্রে অবিরাম শিক্ষার কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল ২০০৩-০৪ কর্ম বর্ষ থেকে ২০০৮-০৯ কর্ম বর্ষ পর্যন্ত। এই প্রয়াসের ফলাফল নীচের সারণীতে দেওয়া হল।

TEQIP - Programmes on Services to Community and Economy

Programme		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
Activities undertaken for organized sector	Programmes conducted সর্বমোট - ১,৭৪৬ টি	82	204	387	427	453	193
	Beneficieries সর্বমোট -৬৭,৬৩৫ জন	1377	3442	6682	11681	27514	16939
Joint training & continuing education Programes for technocrats & academics	Programmes conducted সর্বমোট- ১,৪৫২ টি	55	94	274	375	434	220

উপরোক্ত সারণী থেকেই দেখা যাচ্ছে ছয় বছরের প্রচেষ্টায় সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য কাজ করাই সম্ভব হয়েছে।

— এখনও পর্যন্ত অবিরাম শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ক্লাসরুম শিক্ষা এবং মুদ্রিত পুস্তক নির্ভর। আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আজও আমরা একই শিক্ষাদান পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছি তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আজ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

— তাছাড়া অবিরাম শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একই বিষয়ে বিভিন্ন রকম সিলেবাস অনুসরণ করে থাকেন। কোন একটি বিষয়ে সারা দেশে একই কার্যক্রম চালানো উচিত এবং অবিরাম শিক্ষার কার্যক্রমগুলির প্রতিষ্ঠানগত স্বীকৃতি প্রয়োজন। অনেক সময় বিভিন্ন সোনালী স্বপ্ন দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফীস নিয়ে অবিরাম শিক্ষার কার্যক্রমগুলির চালানো হয় যার কোন স্বীকৃতিই নেই। এই প্রবণতা আইন করে বন্ধ হওয়া দরকার। আমি যখন হায়দ্রাবাদে ছিলাম পশ্চিমবঙ্গের দুর্গম গ্রাম থেকে আসা ছেলেদের দেখেছি যারা বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন এক অনামা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে Aircraft technician এর কোর্স করার জন্য যার কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। ফল যা হবার তাই হতো, কিছুদিন পর এরা নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতো সব কিছু হারিয়ে।

—এই ঘটনাটি হয়তো একটি শঠতার উদাহরণ, কিন্তু অনেক প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানও অনেক সময় না ভেবে চিন্তে অবিরাম শিক্ষার পাঠক্রমের পঠন কার্যক্রম চালু করেন যার ফল হয় মারাত্মক।

হয়তো আরও অনেক কিছু লেখা যায় এই বিষয়ে। কিন্তু বুঝতে পারছি পাঠকদের কপালে ভাঁজের সংখ্যা বেড়ে গেছে, আমাকে থামাতে পারছেন না বলে—তাই আজ এখানেই দাঁড়ি টানা যাক—'আরো কিছু অন্য কোন ক্ষণে'।

References:
1. From Internet - Implementation Completion Report for TEQIP (March 12, 2003 to March 31, 2009), Min. of HRD, Govt. of India.
2. Paper by Prof. Tandra Mitra - 'Continuing Education for Technocrats - Indian Perspective' in the book 'Facets of Continuing Education'.

● Temper কারখানার চোখে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়ণ—*পর্ব-৪, বিষয় - পরিকল্পনা*

সূচনা ঃ

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে সফল ভূমিসংস্কার হয়েছে ভারতবর্ষের বাকী রাজ্যের তুলনায়। এ নিয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ভূমিসংস্কারের ফলশ্রুতি হিসেবে খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছে আমাদের রাজ্য, গ্রামে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে আর এসবের মিলিত ফলে শিল্পায়ণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও। প্রায় মরে যাওয়া বা না থাকা কর্মসংস্কৃতি ও স্বউদ্যোগের স্পষ্ট বিকাশ লক্ষিত হয়েছে গ্রামে, যার প্রভাব মফঃস্বল ও শহরেও পড়েছে। আমাদের সাধ্যমত আগের পর্বগুলিতে এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে। 'কর্মসংস্কৃতি' ও 'স্বউদ্যোগের' মতনই 'পরিকল্পনা' হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এরই মধ্যে শিল্পায়ণের অভিমুখ অনেকটাই স্পষ্ট হয়।

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি বিষয় ঃ

● আমাদের রাজ্যে কৃষির তুলনায় শিল্পে সংস্কারের সুযোগ অনেক সীমিত। মৃত বা রুগ্ন শিল্পের জমির পুনর্বন্টন এবং সম্ভাবনা থাকা রুগ্নশিল্পের পুনর্গঠনের মধ্যেই মূলতঃ সংস্কারের সুযোগ সীমিত রয়েছে। আইনের জটিলতায় তা বেশ কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। বাজার অর্থনীতিতে প্রচলিত ধারণা হল ছোট বা মাঝারি সংস্থা প্রতিযোগিতায় বৃহৎ সংস্থার কাছে টিকতে পারে না। আমাদের রাজ্যে নতুন শিল্পায়নের সম্ভাবনা ছোট ও মাঝারিতেই বাস্তবে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে স্থায়ীভাবে বিকশিত করতে বিশেষ পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে।

● কৃষিতে ভূমিসংস্কারের ফলে ব্যক্তি মালিকানা বিলুপ্ত হয়নি কেবল অতি বৃহৎ জমির মালিকের জমি অনেক সংখ্যক ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বিলি হয়েছে। পরবর্তীকালে উন্নত সেচ, সার, যন্ত্রাদি, বীজ প্রভৃতি উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ভূমিসংস্কার স্থায়ী হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি কৃষিতে গুণগতমানে উৎপাদনের বৃদ্ধি এবং উৎপাদন খরচ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে যে ৮০-র দশক থেকে রাজ্য খাদ্যে স্বনির্ভর হয়েছে এবং কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ধারাবাহিকভাবে। ক্রয়ক্ষমতার উপযোগী সামগ্রীর ও পরিষেবার প্রয়োজনও বাজারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে।

● ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ভূমিসংস্কারকে সামজিক নিরাপত্তা দিয়েছে। এই ব্যবস্থা যত বেশি গণতান্ত্রিক ও দক্ষ হয়েছে ততই এই নিরাপত্তার মান ও পরিধি বেড়েছে। ফলে সুরক্ষিত স্বাধীন মানুষ আরও বেশি বেশি করে সৃজনশীল হয়েছেন এবং কর্মদক্ষতায় বৈচিত্র্যের ছাপ পড়েছে। এই ধারণা আরও মজবুত হয়েছে কারণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্র বা দক্ষতা যেখানেই নিম্নগামী হয়েছে সেখানেই সামাজিক ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভীষণভাবে। সুষম বিকাশের বদলে সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তি বেড়ে গেছে।

● পতিত জমি মাত্র ১ শতাংশ এবং জনঘনত্ব দেশের মধ্যে সর্বাধিক হওয়ায় শিল্পের উপযোগী জমির অভাব স্বাভাবিক। জমির প্রশ্নে সতর্কতার অভাব ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা শিল্প সম্ভবনাকে যে বিরাট ক্ষতি করতে পারে তা আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি। এছাড়া আমাদের রাজ্যে শিল্পের জন্য জমিকে সমান্তরালের (horizontal) পরিবর্তে খাড়া বা উল্লম্বভাবে (vertical)ব্যবহারের পরিকল্পনা অবশ্যই করতে হবে আমাদের রাজ্যে। শিল্প ছাড়া নগরোন্নয়ণে জমির প্রয়োজন হবে এবং সেই ক্ষেত্রেও একই ধারা প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

মূল কয়েকটি বিষয় ঃ

● **পরিষেবা ঃ** জমির প্রতিকূলতার জন্য সব ধরনের শিল্পের সুযোগ আমাদের রাজ্যে কম। ফলে পরিষেবা ক্ষেত্রটি রাজ্যের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর শিল্পায়ণের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির গুরুত্ব বোধহয় সবচেয়ে বেশী। বর্তমানে রাজ্যে কর্মরত মানুষের আনুমানিক ৫০ শতাংশ কৃষি, ২৬ শতাংশ শিল্প এবং ২৪ শতাংশ পরিষেবার উপর নির্ভরশীল। তবে ভারতবাসীর গড় কৃষি নির্ভরতা আমাদের তুলনায় ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বেশি। পৃথিবীর সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশে সাধারণভাবে ২০ শতাংশের কম মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত থাকেন। বাকীরা শিল্প উৎপাদনে বা পরিষেবায় যুক্ত থাকেন। দুটো ক্ষেত্র কৃষির তুলনায় অনেক বেশী সম্পদ তৈরি করে, ফলে সার্বিকভাবে দেশের সমৃদ্ধি ঘটে। আজকের পৃথিবীতে তথ্য ও প্রযুক্তি পরিষেবায় বিপ্লব ঘটে গেছে। আমাদের রাজ্য তুলনায় দেরিতে শুরু করলেও তথ্য ও প্রযুক্তি পরিষেবায় অন্যান্য পরিষেবা ক্ষেত্রগুলির তুলনায় বিগত দশ বছরে বোধহয় সর্বাধিক কর্মসংস্থান হয়েছে। মাথাপিছু computer বিক্রিতে আমাদের স্থান দেশের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে। এই ক্ষেত্রটির বিকাশের ফলে একদিকে যেমন সারা পৃথিবী অনেক হাতের কাছে হয়ে গেছে তেমনি ক্ষেত্রটিতে বহুজাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বেশি হওয়ায় বিশ্বমন্দার প্রভাব দ্রুত পড়েছে। এই ঘাটতি সম্পর্কে সতর্ক থেকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপক বিকাশ ছাড়া শিল্প সমেত কোনও অগ্রগতিই সহজে হবে না। এই ক্ষেত্রের মানবসম্পদ

সৃষ্টি করতে পারলে লগ্নি সহজে পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য কারিগরী শিক্ষা (Technical Education) এবং শিল্প সংক্রান্ত স্বাস্থ্য (Industrial Health) পরিষেবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের রাজ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা দুটির গরিষ্ঠাংশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সরকারী স্তরে ডাক্তার ও শিক্ষকসহ এই পরিষেবা দুটির সঙ্গে যুক্ত সবধরণের কর্মীরই বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে দু দশকে। এই সময় ব্যক্তি পুঁজিরও লক্ষ্যণীয় বিনিয়োগ হয়েছে এই দুটি ক্ষেত্রে। কিন্তু তবুও পরিষেবা দুটির গুণমান বাড়াবার অনেক অবকাশ রয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় আইন, পরিচালন দক্ষতা ও দায়বদ্ধতার বিশেষ উন্নতি অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। এই দুটি পরিষেবার ব্যাপক উন্নতি শিল্পায়ণকে এক জোরালো ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে। জ্ঞানভিত্তিক শিল্পের বাস্তবায়ণও সম্ভব হবে। এছাড়া এই দুটি পরিষেবাকে যদি বিশ্বমানে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে তথ্য ও প্রযুক্তির সাহায্যে দেশের অন্যান্য রাজ্য ও বাইরেও এর চাহিদা সৃষ্টি হবে। জন্মলগ্ন থেকে আমেরিকার দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ কিউবা সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর বৈদেশিক সহায়তা ছাড়াই দেশের অর্থনীতিকে ভেঙ্গে পড়তে দেয়নি। এই উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরিষেবা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আমেরিকানরাও কিউবাতে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন এবং তার সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। অনাবাসী ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে পশ্চিমী দুনিয়ায় মন্দার ফলে দ্রুত মোহ কাটছে, তাঁরা দেশে উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে রয়েছেন। আমাদের তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় দ্রুত উন্নতি করতে সব ধরনের সুযোগ ব্যবহার করতে হবে আর এই পরিষেবাগুলির অভিমুখকে অবশ্যই শিল্পায়ণের সহায়ক হতে হবে।

● **পরিবহন ঃ** আমাদের মত গরীব দেশে শিল্পে অগ্রগতি করতে গেলে উন্নত পরিবহন পরিকাঠামোর প্রয়োজন সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। বিগত দু দশকে সড়ক পরিবহনে বিশেষ উন্নতি হয়েছে, ফলস্বরূপ দেশের প্রায় সর্বত্র যেমন তুলনায় সহজে যাওয়া যাচ্ছে তেমনি মোটর গাড়ি শিল্পের (Automobile Industry) যুগান্তকারী বিকাশ ঘটেছে। ছোট-বড় নানান ধরনের মোটর গাড়ি তৈরি হচ্ছে দেশে, যার অনেকগুলি আন্তর্জার্তিক মানের। কিন্তু মোটর গাড়ির জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির জোগান ভবিষ্যতে অনিশ্চিত এবং খরচও বিগত দশকে অতি দ্রুত বেড়েছে। আমরা আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতাতেও এটা বুঝতে পারছি। আমাদের শুরুর প্রথম দশ বছর ১৫/২৫ কি.মি. দূরে হাওড়ার বিভিন্ন শিল্প থেকে ৯৫ শতাংশ কাজ আসত। আর বর্তমানে ২০/৩০ কি.মি. দূরত্বের কাজ পরিবহণ খরচার জন্য ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। ফলে তাপ প্রক্রিয়াকরণ কারখানাটি হয়ত আগামী দিনে আর এক ছাতের তলায় থাকবে না, ভৌগোলিক অবস্থান পাল্টাতে বাধ্য হবে। আমাদের মত ছোট ও মাঝারিসহ সব ধরনের শিল্পের জন্যই অর্থনৈতিক ক্ষমতা সীমিত হওয়ায় স্বল্প ব্যয়ের বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা অতি জরুরী। ইস্পাতের চাকা ইস্পাতের রেল লাইনের উপর দিয়ে রেলওয়ে পরিষেবায় ব্যবহৃত হয়। এতে কম ঘর্ষণের জন্য শক্তি অনেক কম লাগে অন্যান্য পরিবহন যানের তুলনায়। কলিকাতা শহরে তুলনায় অনেকটাই আধুনিক মেট্রো রেলওয়ের ভাড়া অনান্য পরিবহন ব্যবস্থার তুলনায় কম এবং গতিতেও দ্রুত ও পরিবেশ বন্ধুও। শিল্পে প্রতিবেশী চীন দেশ ৭০ দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত আমাদের থেকে নিশ্চিতভাবে পিছিয়ে ছিল, তারপর পরিকল্পিতভাবে এগোন শুরু হয় আর আজকে বহু আগে এগিয়ে গেছে। রেল পরিষেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি চীনের আজকের উন্নতির জন্য বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। ৯০-এর দশকের শুরু পর্যন্ত ভারতে চীনের তুলনায় দীর্ঘতর রেলব্যবস্থা ছিল। কিন্তু চিত্রটা আজ পাল্টে গেছে। নিম্নের সারণীতে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলঃ

বিষয়	চীন	ভারত
বিনিয়োগের পরিমাণ	৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৭.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
দৈর্ঘ্য	৭৬,০০০ কিমি	৬৪,০০০ কিমি
বৃদ্ধির হার বছরে	২৪%	১%
গতি (গড়)	২০০ কিমি/ঘন্টা	৪০ কিমি/ঘন্টা
(সর্বাধিক)	৩৫০ কিমি/ঘন্টা*	১০০ কিমি/ঘন্টা
গড় খরচ (২০০২ সালে)	০.৬৫ মার্কিন সেন্ট/কিমি**	০.৭৫ মার্কিন সেন্ট/কিমি**

* এই মুহূর্তে পৃথিবীর মধ্যে দ্রুততম।

** যাত্রী পরিবহন ও পণ্য পরিবহনের গড়।

আমাদের ৮০র দশকের শেষদিকে রেল লাইনের Point and Crossing-র উপর কিছু কাজের সুযোগ হয়েছিল। সাধারণ কার্বন স্টীলের জায়গায় ম্যাঙ্গানিজ স্টীলের point and crossing তৈরি হচ্ছিল। ঐ সময়ের ধারেকাছে কাঠের sleeper, কংক্রীটের sleeper দিয়ে পরিবর্তনের কাজও চলছিল রেলে। দুটোর মিলিত ব্যবহারে ট্রেনের গতি ২০০

কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত করা সম্ভব হবে শুনেছিলাম যদি উপযুক্ত ইঞ্জিন ও কামরা তৈরি করা যায়। ম্যাঙ্গানিজ স্টীলের point and crossing ও কংক্রীটের Sleeper দুটোর-ই কাজ প্রায় এক দশক হল সম্পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু গড় গতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, লোহা সহ সব কিছুর খরচা বহুগুণ বেড়ে গেলেও রেলের ভাড়া বোধহয় রাজনৈতিক কারণে প্রায় ১৫ বছর একই আছে, ফলে পরিষেবাটি বর্তমানে অর্থকষ্টের ফলে গুণমানে ও নিরাপত্তায় পিছিয়ে পড়েছে, আর নতুন লগ্নি প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য হচ্ছে। বিগত ১৫ বছরের বেশিরভাগ সময় রেল-পরিসেবায় মন্ত্রী বা সিদ্ধান্তকারী বা গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীরা আমাদের রাজ্যের নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে থেকে রয়েছেন। তা সত্ত্বেও বিশেষ ভাল কিছু হয়নি বরং পরিষেবার নিরাপত্তা ও মান দুই-ই নিম্নমুখী হয়েছে। এমনকি আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের ভারকেন্দ্র মুম্বাই-এর সঙ্গে আমাদের রাজ্যের রেল পরিষেবা এক বছরের বেশি বিঘ্নিত রয়েছে রাজনৈতিক কারণে। বিগত ১৫ বছরে উল্লেখিত বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানের ফলে যদি আজ দুর্গাপুর-শিলিগুড়ি-কল্যানী-খড়গপুর-হাওড়া-হলদিয়ার মধ্যে চীনের অনুরূপ রেল পরিষেবা গড়ে উঠত বা উদ্যোগ নেওয়া হত তাহলে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা আমূল পাল্টে যেত।

● **পরিবেশ ঃ** পৃথিবীর ভেতর প্রথম শিল্পায়ন বা শিল্পবিপ্লব ইউরোপে হয়েছিল দুশতক বছরের কিছু আগে। অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক নানান কারণ রয়েছে এর পেছনে। তবে ইউরোপের শীতল তাপমাত্রা বোধহয় মূল কারণ এই শিল্পবিপ্লবের জন্য। শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি 'তাপ' বৃদ্ধিকে এই শীতল পরিবেশ অনেকটাই সহ্য করে নিতে পেরেছিল, যা উষ্ণ পরিবেশে অসুবিধার কারণ হয়েছিল। পরবর্তীকালে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী সারা বিশ্বে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং উষ্ণ পরিবেশের অসুবিধার কথা বুঝে নানান প্রতিকারক ব্যবস্থাও আবিষ্কার হয়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে এই 'তাপ' বৃদ্ধির বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা থাকলেও এর বিশ্বপরিবেশের উপর কুফল সম্পর্কে চেতনা প্রায় ছিল না বলাই ভাল। কিছু বিজ্ঞানীর অক্লান্ত প্রয়াসে বর্তমানে চেতনা কিছুটা ছড়িয়েছে। তবে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। আমাদের পরিচিত সাহা ইন্স্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক ডা. পলাশবরণ পালের ধারণা—'যে সমস্যাটা বিশাল এবং ভয়ঙ্কর তা হলো, পৃথিবী নামক গ্রহটির বেশিরভাগ মানুষই এখনো পর্যন্ত পরিবেশ নিয়ে কোনো সমস্যা যে আছে, এই কথাটাই জানেন না বা মানতে রাজি নন'। ফলে সচেতনার কাজ 'আস্তে আস্তে করলে বোধহয় চলবে না। কারণ হাতে সময় খুব বেশি নেই।' ডারবানের আগে২০০৯ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন-এ পরিবেশ, চেতনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্ব-সম্মেলন হয়েছিল এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সহমতের ভিত্তিতে 'কোপেনহেগেন একর্ড (accord)' নামে একটি ঘোষণা ও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি স্টকহোম পরিবেশ সংস্থা (Stockholm Environment Institute) বিশ্বের প্রথম সারির চারটি সমীক্ষক সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী জানিয়েছেন যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমন কমানোর জন্য এই সম্মতিপত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির হয়েছিল তা পূরণে ভারতসহ উন্নয়ণশীল দেশগুলি উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের সময় এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা উচিত। কারণ ভারতবর্ষ হল পৃথিবীর অন্যতম বেশি জনঘনত্বের দেশ। পৃথিবীর মাত্র ২% জমিতে পৃথিবীর ১৭% মানুষের বাস আর আমাদের রাজ্যে জনঘনত্ব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী, ভারতবর্ষের গড় জনঘনত্বের তিনগুণ। এর উপর আবহাওয়াও উত্তরবঙ্গ বাদ দিলে বেশ গরম। ফলে সঠিক সচেতনার এবং সতর্কতার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে।

ইস্পাতের 'তাপ প্রক্রিয়াকরণ' (Heat Treatment) আমরা করে থাকি কারখানায়। ফলে 'তাপ' সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বা সচেতনা আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে কিছুটা। আমাদের রাজ্যে কয়লা ও আকরিক লোহার ভৌগোলিক সুবিধা থাকার ফলে ভারতে ইস্পাত শিল্পের শুরু এবং বিকাশ অনেকটা এখানেই ঘটেছিল। পরবর্তীকালে দেশভাগসহ নানান আর্থ-সামাজিক কারণে জনঘনত্ব খুবই বেড়ে গেছে। ফলে ইস্পাতের মত তুলনায় উচ্চ গলনাঙ্কের শিল্প বস্তুর সবটাই অর্থাৎ গলানো থেকে শেষ পর্যন্ত করার উদ্যোগ নিলে তাপজনিত কারণে পরিবেশের ভারসাম্যের অনেকবেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবার আশঙ্কা থাকবে। আবার শিল্পে ইস্পাতের গুরুত্ববিচার করে ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আমাদের রাজ্যের উপযোগী হবে গলানোর পরবর্তী ক্ষেত্রগুলি যেমন গরম করে বিভিন্ন ধরনের আকার দেবার পদ্ধতিগুলি এবং তাপ প্রক্রিয়করণ ক্ষেত্রটি। অর্থাৎ তৈরির মধ্যবর্তী পর্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত করা। শুরু থেকে মধ্যবর্তী পর্যায় পর্যন্ত তৈরি সামগ্রী দেশের অন্যত্র থেকে নিয়ে আসা। এতে তাপের প্রয়োজন অর্ধেকের মত হবে। গলানোর জন্য যে শিল্পগুলি রয়েছে তা এখনই বন্ধ না করে

কেবল নতুন সংযোজন না করার পরিকল্পনা নেওয়া-ই ভাল। এইরকম বায়ু বা জলদূষণের ক্ষেত্রগুলিকেও বিচারের মধ্যে আনতে হবে পরিকল্পনার সময়।

● **পুঁজি ঃ** শিল্পায়নে পুঁজির অপরিহার্যতা আমরা সবাই বুঝি। এই পুঁজির জোগান-বিষয়টা জটিল এবং ঠিক মত বোঝবার জন্য বিশেষজ্ঞের দরকার। ফলে আমরা আমাদের স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে যা বুঝেছি, তা জড়ো করে যে চেষ্টা করব তার মধ্যে খামতি থাকবেই, তবে চেষ্টা করব খাঁটি উপলব্ধিগুলিকে এক সূত্রে বাঁধার। অতি সাধারণভাবে পুঁজি দু প্রকারের হয় ব্যক্তি পুঁজি ও রাষ্ট্রের পুঁজি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ব্যক্তি পুঁজির প্রভাব সহ সব গুরুত্বই অনেক বেড়ে গেছে আগের তুলনায়। বোধহয় এর ফলস্বরূপ ধনী ও দরিদ্র্যের ফারাক বাড়বার গতি অতীতের সমস্ত সমাজব্যবস্থার তুলনায় অতি দ্রুত বাড়ছে। ব্যক্তি পুঁজির সবচেয়ে ক্ষতিকারক কাঠামো বা ব্যবস্থাটা বোধহয় 'ভাসমান পুঁজি'। এই পুঁজির লাভ ছাড়া আর কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না। বিশ্বায়নের ফলে এর বিচরণের কোনও গন্ডি নেই। যখনই কোনও কিছুতে লাভের চাহিদা পূরণ হয় না তখনই এই পুঁজি অন্যত্র চলে যায়। সাধারণত শেয়ার বাজার, রিয়েল এস্টেট, দালালি (নানান মোড়কে) প্রভৃতি অস্বচ্ছ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই টাকা লগ্নি হয়। ফলে অল্প সময়ে অতি লাভের জন্য দামের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বোধহয় পৃথিবীর ব্যক্তি পুঁজির নিয়মবর্হিভূত সমস্ত অর্থই এই বিশ্ব ভাসমান পুঁজিতে মিলেছে বিশ্বায়নের নামে। বিশ্বায়নের পরে বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট যতগুলি হয়েছে তার মূলকারণ দেখা গেছে নিয়ন্ত্রনহীন এই ভাসমান পুঁজির অবাধ বিচরণ। সারা দুনিয়াব্যাপী নানান অন্বেষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে ব্যক্তিপুঁজির এই আগ্রাসনকে নিয়ন্ত্রণ করার। বিগত দু'দশকে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতেও ব্যক্তিপুঁজির প্রভাব বাড়লেও Bank, বীমার গরিষ্ঠাংশ রাষ্ট্রের হাতে থাকায় পুঁজির নিয়ন্ত্রণের সুযোগ এখনও রাষ্ট্রের হাতেই বেশী রয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রের কর আদায়ের একটি নীতি ও সংগ্রহ করার মত ব্যবস্থা রয়েছে। Tax সংগ্রহ বেড়েছে বিগত দশকের বেশির ভাগ বছরে। যদিও বাড়াবার আরও সুযোগ রয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা দুটি মাত্র উদাহরণ দেব। (১) বিশ্বায়নের পর ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিকাশ পৃথিবীর সামনের সারিতে রয়েছে এবং ২০% থেকে ২৫% অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ কোটি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা এমন পর্যায় উন্নীত হয়েছে যে বিশ্বের সমস্ত প্রস্তুতকারক সংস্থার কাছে ভারতবর্ষের বাজারে প্রবেশ করার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এই উচ্চ ক্রয় ক্ষমতার ক্রেতার সঙ্গে করদাতার মধ্যে সংখ্যার ফারাকটা কমাতে পারলেই করদাতার সংখ্যা তিন চার গুণ বাড়বেই। (২) কিছু অর্থনীতিবিদ হিসেব করে বলছেন পৃথিবীর কালো টাকার অর্ধেকের বেশী ভারতবর্ষ থেকে তৈরী হয়েছে। বিষয়টা সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে এই বিশাল পরিমাণ টাকা আমাদের কর ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে অবশ্যই হয়েছে। বর্তমানে কম্পিউটার, তথ্য ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিকাশ কর সংগ্রহ ব্যবস্থাকে অনেক দক্ষ করেছে। এই দক্ষতাকে ঠিকমত কাজে লাগালে কর সংগ্রহ অনেকটাই বাড়বে। কর সংগ্রহের উপরই রাষ্ট্রের পুঁজির পরিমাণ অনেকটাই নির্ভর করে। নিয়ম অনুসারে কর সংগ্রহ বাড়ান এবং তার আজকের তুলনায় আনুপাতিক বেশী শতাংশ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সমস্ত নির্বাচিত সংসদ সহ গরিষ্ঠাংশ রাজ্যবাসী সহমত হলে রাজ্যের হাতে অর্থের জোগান অনেকটাই সুবিধাজনক হতে পারে। রাষ্ট্রীয় পোষ্ট অফিস বা ব্যাঙ্কগুলিতে সংগৃহীত আমানতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাঙ্কের মোট ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া উচিত (সাধারণ অবস্থায়)। এই সহজ বিষয়টি আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই মানা হয় না। এটা পাল্টানোর ব্যাপারেও যদি অনুরূপ সহমত গড়ে তোলা যায় তাহলে রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে ছোট বা মাঝারি শিল্পের জন্য অর্থ জোগানের সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শেষ দুটি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের শাসক জোটের উপর স্থায়িতের প্রশ্নে অনেকটাই নির্ভরশীল রয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ অশোক মিত্রের উপদেশ হল এই সুযোগে কেন্দ্রকে দিয়ে রাষ্ট্রীয় শিল্পে অধিক পরিমাণে লগ্নি করান উচিত। এর ফলে বড় লগ্নিতে দেশী বা বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীলতা অনেকটাই কমবে। সব মিলিয়ে শিল্পায়নে রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগের যে পরিস্থিতি রয়েছে আমাদের রাজ্যে তাকে কাজে লাগান উচিত।

সারাংশ (চারটি পর্বের)

● শিল্পায়নের লক্ষ্য হওয়া উচিত গরিষ্ঠাংশ রাজ্যবাসীকে এক উন্নত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরী করার জন্য, সমৃদ্ধতর করা যাতে দারিদ্রতা যা কিনা মানবজাতির লজ্জা তা থেকে মুক্ত হয়ে রাজ্য দেশের সামনের সারির রাজ্যগুলির মধ্যে নিজের আসন স্থায়ী করতে পারে এবং বিশ্বায়নের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীন অগ্রগতির জন্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

● শিল্পায়নের জন্য রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলগুলির ন্যূনতম সহমত, প্রয়োজনীয় সামাজিক স্থিরতা এবং কেন্দ্রের কাছে ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

● শিল্পায়নের ভারকেন্দ্র হবে রাজ্যের ছোট ও মাঝারি শিল্প। এর জন্য কর্ম্মসংস্কৃতির বিকাশ, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অর্থের জোগান, সঠিক ভাবে আধুনিক শিল্প তালুকের বিকাশ, স্বউদ্যোগের বিকাশ, আন্তর্জাতিক গুণগত মান, দাম ও জোগান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

● শিল্পায়নের উপযোগী তথ্য ও প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ধারাবাহিক বিকাশ।

● শিল্পায়নের উপযোগী আধুনিক রেল পরিষেবাকে মুখ্য করে পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

● শিল্পায়নে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনা ও রক্ষণাবেক্ষণের যে প্রয়াস শুরু হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রাখা।

● শিল্পায়নের স্বার্থে কৃষিকে আধুনিক করা যাতে খাদ্য নিরাপত্তা, কাঁচামালের জোগান, উৎপাদনশীলতা, শ্রমশক্তির জোগান প্রভৃতি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি নিশ্চিত থাকে।

পরিশেষঃ তপনদা মৃত্যুর শেষ দিকে বলতেন ''বিশ্বের শিল্পবিকাশের প্রায় ২৫০ বছরের ইতিহাসের শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্ব্বাধুনিক অগ্রগতিকে হাতিয়ার করে রাজ্যের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী শিল্প গড়তে হবে। শিল্পায়নের ফলে গরিষ্ঠাংশ রাজ্যবাসী যাতে সমৃদ্ধ হতে পারেন তার জন্য মূলতঃ তিনটি সামাজিক দ্বন্দ্বকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে হবে বিশ্বায়নের যুগেঃ

(১) সম্পদ বিনিষ্টকারী (value eater)-র সাথে সম্পদ সৃষ্টিকারী (value adder)-র দ্বন্দ্ব।

(২) পুঁজির সাথে কর্ম্মসংস্কৃতির দ্বন্দ্ব।

(৩) পুঁজিপতির সঙ্গে স্বউদ্যোগীর দ্বন্দ্ব।''

মাত্র ৫২ বছর বয়সে তপনদা মারা গিয়েছিলেন ১৮ই ফ্রেব্রুয়ারী ২০০১ সালে। তারপর প্রায় ১১ বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু যত সময় যাচ্ছে রাজ্য বা দেশ বা বিশ্বে যে পরিবর্তন হচ্ছে তাতে তাঁর মতামতের সত্যতা ক্রমেই বেশী বেশী করে প্রমাণিত হচ্ছে। আমরাও ধারাবাহিকভাবে কর্ম্মসংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে স্বউদ্যোগের বিস্তার নিশ্চিত করে রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জোরালো করব।

Temper কারখানার পক্ষ থেকে বিপ্লব ভড়

কবিগুরুর সার্ধশততম জন্মবর্ষে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ২০১০

দর্শকবৃন্দ

Energy - Present & Future- Few questions

A collating initiative by TMC group

As is known to everyone, life would not have been there without energy! The essential ingredient of life i.e. Energy, has been manipulated (unknowingly in early phases of human civilization and knowingly after man becomes the producer of his own food) over the years for several reasons and intentions.

As is also well known, the three-fold global energy crisis has emerged since the 1970s; it is now acute on all fronts.

1) Severe climate change, caused mainly by emissions of carbon dioxide from fossil fuel burning and associated emissions of other greenhouse gases;

2) The security of oil supplies, given the political and military turmoil in much of the oil exporting world, centered in the Persian Gulf region;

3) Nuclear weapons proliferation and its potential connections to the spread of nuclear energy to address climate change.

These issues are intimately connected. Oil is a leading source of global and U.S. carbon dioxide (CO2) emissions as well as a principal source of local air pollution, and often the main one in cities. Concerns about the insecurity of oil supply are not new.

It is a well establish procedure to define the problem first and then the find out the sources of the problems for analysis. Just to have an idea of the gamut of the impending crisis about energy issues let us have a closer look of few statistical tables & diagrams.

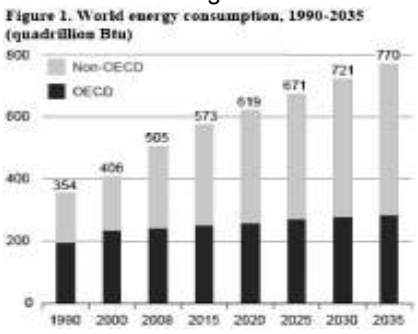

The Figure above shows that the estimated energy consumption for Non-OECD countries is supposed to grow manifold in comparison to OECD[1] countries.

Let's take another figure which denotes the probable sources from where the energy requirement would be met.

The Figure-2 shows that liquid fuels and coal would be the most dominating resource in the energy market. Considering the fact that both these sources are well known pollutant,

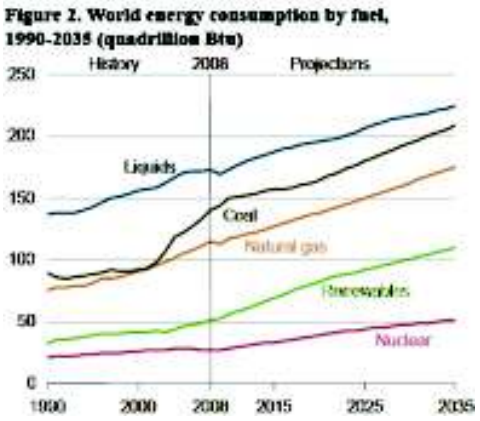

is it desirable? The only silver lining is the fact that the growth rate of consumption of natural gas and renewable are quite strong! There are two aspects of these revealation. One that

[1] Organization for Economic Co-operation and Development. The origin dates back to 1960, when 18 European countries plus the United States and Canada joined forces to create an organization. Today there are 34 member countries. The members are: -

AUSTRALIA, AUSTRIA, BELGIUM, CANADA, CHILE, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ICELAND, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, KOREA, LUXEMBOURG, MEXICO, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NORWAY, POLAND, PORTUGAL, SLOVAK REPUBLIC, SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY, UNITED KINGDOM, UNITED STATES.

geoplitics over the energy security is to stay and shall become more fierce in future, the 2nd is human beings will be subjected to more environmental hazards.

Figure 3. World liquids consumption by sector, 2008-2035 (million barrels per day)

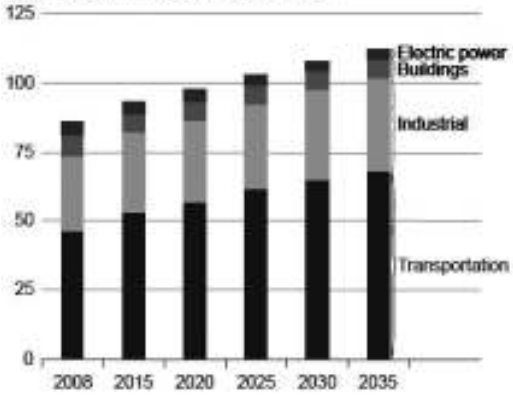

The figure above shows the consumption by sectors of the liquid fuel. It is evident that transportation alone will be consuming more than 60% of the total. Unless some more stringent measure is taken for reducing the emission criteria from these, there lies a probability of outbreak of more unknown airborne deases.

Figure 4. Natural gas production in China, Canada, and the United States, 2008 and 2035 (trillion cubic feet)

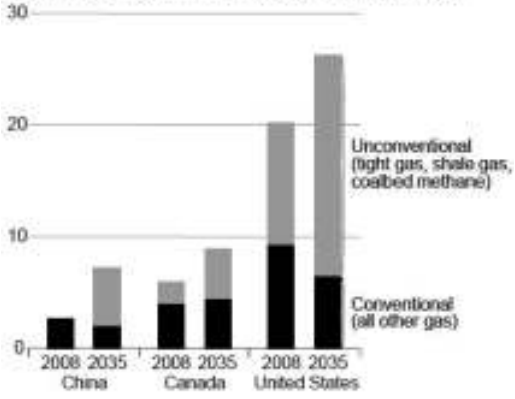

The figure above shows China, Canada & USA would not only be diversifying heavily on the usage of unconventional gases in future, but reducing their dependence on conventional gases in future.

Figure 5. World coal consumption by region, 1990-2035 (quadrillion Btu)

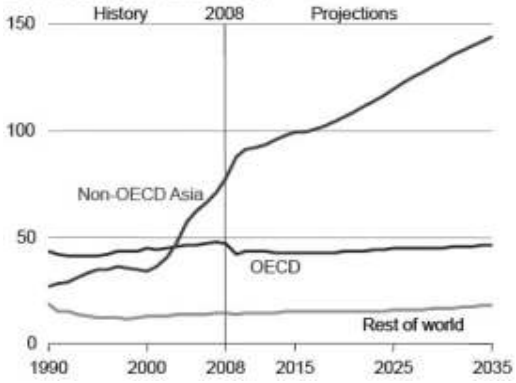

The regional pattern of coal usage increase could be a warning signal as clearly seen from the above figure. It is evident that major chunk of the usage would come from Non-OECD Asia[2]. What does it indicate?

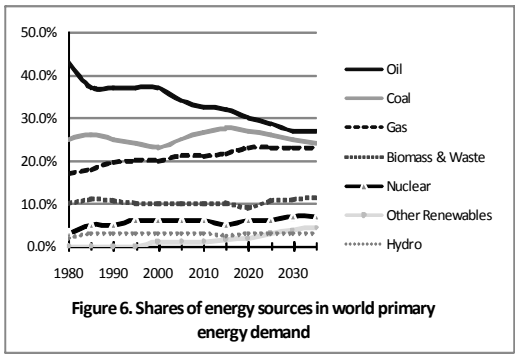

Figure 6. Shares of energy sources in world primary energy demand

In the New Policies Scenario Global primary energy demand grows by 40% between 2009 & 2035, though oil remains the leading fuel and natural gas demand rises the most in absolute terms, the increasing projected demand of coal is worth mentioning.

[2] Non- OECD Asia means:- Non-OECD Asia and Oceania, excluding China, the DAEs (Chinese Taipei; Hong Kong, China; Indonesia; Malaysia; the Philippines; Singapore; Thailand) and the Middle East.

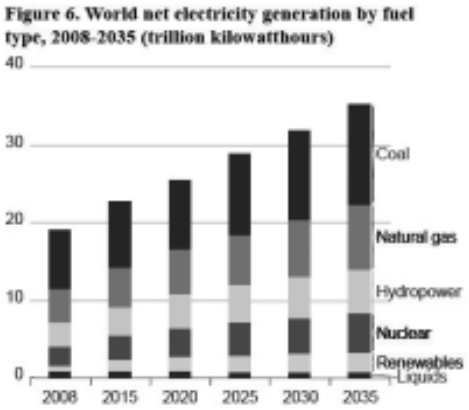

Figure-7. World net electricity generation by fuel type, 2008-2035 (trillion kilowatthours)

Above figure indicates that for electricity alone we would be heavily depending on coal. As is seen hydropower and nuclear growth is almost stagnant.

The effect of the increasing use of the polluting energy sources will definitely put the people future at stake, unless technologies clean coal etc. are made cheaper.

As an alternative to the fossil fuel, the growth of nuclear energy can be seen in the following graph (fig-8). If one considers the percent increase (from 2008 to 2035) of nuclear generation capacity, the highest would be China & India. However, there are certain issues involved with such huge percentage increase. The issues are well known and debated, but well-accepted concrete resolutions are yet to be framed.

Figure-8. World nuclear generating capacity, 2008 and 2035

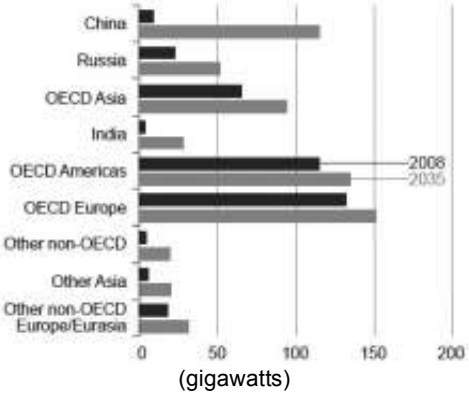

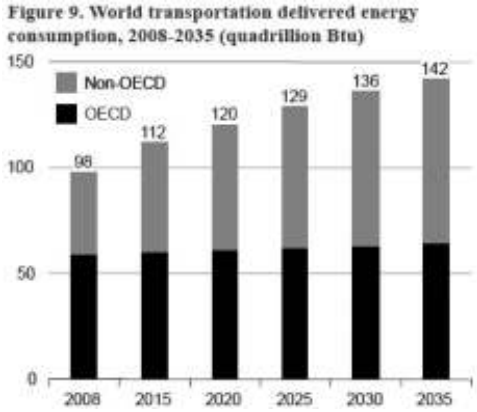

As is seen from the above figure (Fig-9), the energy consumed (or would be consumed) by Non-OECD countries shall increase manifold in comparison to OECD countries. Which means that unless the pollution control norms of the Non-OECD countries becomes much more stringent than that of OECD countries, the population of the Non-OECD countries would be exposed to the menace of pollution by the emissions of liquid poison!

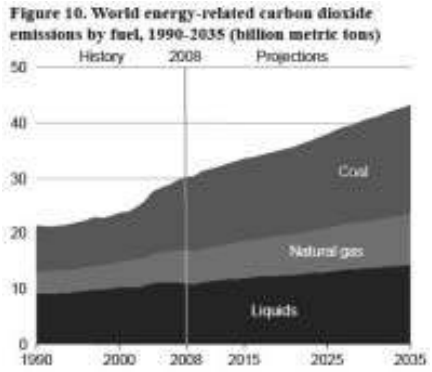

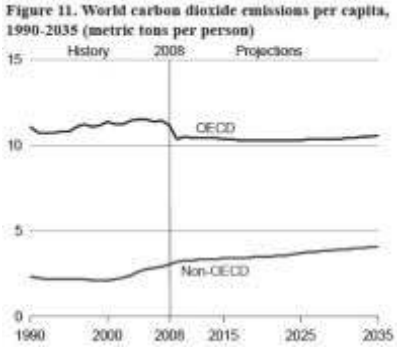

The above two figures (fig 10 & 11) are ample indications of how the fossil fuels are going to affect our lives! As the figures bear significant tell-tell signs, it does not require further elaboration!

Before we conclude; let us look into the status of India in power sector scenario on the issues sustainable development.

Figure-12. Energy use, India

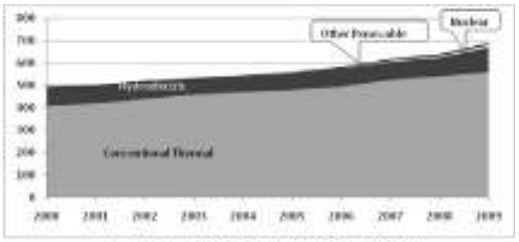

India uses almost as high a proportion of coal as China, though their total energy supply is only a quarter the size. As time goes on, coal will take on even more of the burden - not so much by choice as by default, as imported oil falls away. It seems unlikely that renewable energy will be able to alleviate much of the 20% drop in energy supplies projected to occur by 2050.

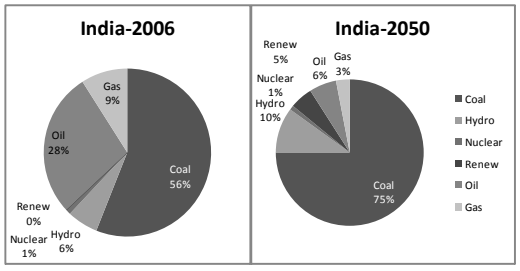

Figure - 14

Though we have seen a boost in the power sector (post Indian Electricity Act), the majority of it came from the thermal power (mostly fossil fuel)!

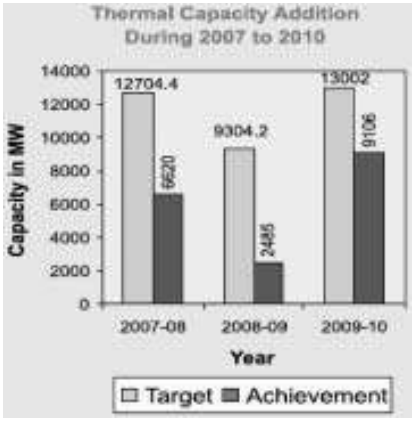

Figure-15

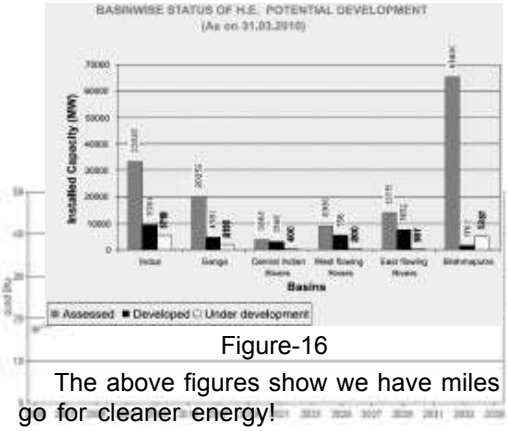

Figure-16

The above figures show we have miles to go for cleaner energy!

Anticipated generating capacity by the end of the Eleventh Plan (2007-2012) (in MW)

	Hydro	Thermal	Nuclear	Wind and Renewables	Total
Installed capacity as on 31 March 2002	26269	74429	2720	1628	105046
Addition during Tenth Plan	7886	12114	1080	6132	27212
Installed capacity as on 31 March 2007	34654	86015	3900	7760	132329
Proposed Addition during Eleventh Plan	15627	59693	3380	14000	92700
Total capacity anticipated as on 31 March 2012	50281	145708	7280	21760	225029

Transportation CO2 Emissions and GDP Growth:-

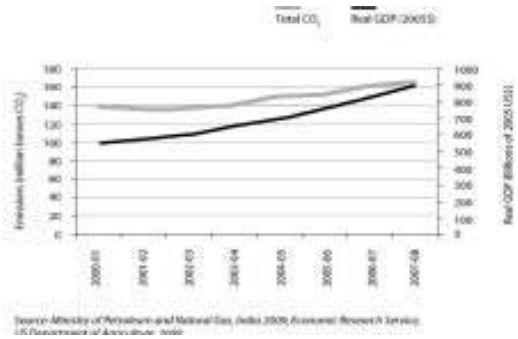

Figure-17

The above figure clearly indicates the statement that unless something done about the increasing dependence of fossil fuel the days ahead are bleak!

Now, let us look into the more safe sources of energy and its utilization:-

The condition of the thermal power plants (age wise) is shown in the table below:-

Capacity range in MW	> 15 years but < 20 years	> 20 years but < 30 years	> 30 years
<200	8(1)	27(9)	108(46)
200/210	38(3)	74(8)	10(3)
250/300	-	-	-
500	9	6	Nil

One of the ways of energy efficiency (with less capital cost) is to engage ourselves in R&M. The status of the same is depicted in the table below:-

S. No.	Particulars	7th Plan (1985-1990/92)	8th Plan (1992-97)	9th Plan (1997-2002)	10th Plan (2002-07)	11th Plan (2007-12)
1	Thermal Power Stations covered (No.)					
	R & M	14	44	10	12	21
	LE	0	0	7	12	31
2	Thermal Units covered (No.)					
	R & M	163	198	130	35	73
	LE	0	0	28	106	77
3	Expenditure: Estimated Cost (INR Million)					
	R & M	10660	23850	11180	7500	25930
	LE	0	0	12940	92000	161840
4	Total Capacity Involved (MW)					
	R & M	13570	20870	17935	6440	18565
	LE	0	0	1910	10413	11186

LE/R&M Program during 11th Plan (2007 – 2012)

Sl No.	Particular	State Sector		Central Sector		Total (State sector + Central Sector)	
		No. of units	Capacity (MW)	No. of units	Capacity (MW)	No. of units	Capacity (MW)
1.	LE works	33	4524	20	2794	53	7318
2.	R&M works	27	6015	49	12950	76	18965
	Total	60	10539	69	15744	129	26283

LE/R&M Program during 12th Plan (2012 – 2017) tentative

Sl No.	Particular	State Sector		Central Sector		Total (State sector + Central Sector)	
		No. of units	Capacity (MW)	No. of units	Capacity (MW)	No. of units	Capacity (MW)
1.	LE works	30	5860	42	10672.19	72	16532.19
2.	R&M works	03	630	20	4341	23	4971
	Total	33	6490	62	15013.19	95	21503.19

There are definitely certain measures and program taken by India in recent times:-

Table ES.1: India's direct CO2 emissions reduction by industry

	Total industry	Iron and steel	Cement	Chemicals and petrochemicals	Pulp and paper	Aluminium	Other industries
Direct CO_2 emissions in industry, Mt CO_2							
2007	413	151	128	46	8	4	74
2050							
Baseline low-demand	1 564	703	422	132	36	14	256
Baseline high-demand	1 852	850	483	173	62	21	256
Baseline strong growth	2 807	1 153	1 060	229	87	22	256
BLUE low-demand	827	333	275	68	17	12	122
BLUE high-demand	908	362	291	77	31	16	129
BLUE strong growth	1 519	532	676	116	50	22	122
Changes in BLUE 2050 vs. 2007							
BLUE low-demand	100%	121%	114%	42%	113%	214%	65%
BLUE high-demand	120%	140%	126%	61%	285%	321%	74%
BLUE strong growth	268%	253%	426%	149%	507%	469%	65%
Changes in BLUE 2050 vs. Baseline 2050							
BLUE low-demand	-47%	-53%	-35%	-48%	-52%	-16%	-53%
BLUE high-demand	-51%	-58%	-40%	-55%	-49%	-24%	-50%
BLUE strong growth	-46%	-54%	-36%	-49%	-43%	-1%	-53%

Another way of reducing pollution is the safe use of nuclear energy. Though there are issues involved, the following table shows an ambitious program.

The possible nuclear power capacity beyond 2020 has been estimated by Department of Atomic Energy (DAE) is shown in the table.

Year	Capacity (GWe)	
	Pessimistic	Optimistic
2030	48	63
2040	104	131
2040	208	275

In energy terms, the Integrated Energy Policy of India estimates share of nuclear power in the total primary energy mix to be between 4.0 to 6.4% in various scenarios in

the year 2031-32. The study by the Department of Atomic Energy (DAE), estimates the nuclear share to be about 8.6% by the year 2032 and 16.6% by the year 2052.

A concept of sustainable development deals with the concept of OVERLAP! Which can be theoretically shown in fig-18 below:-

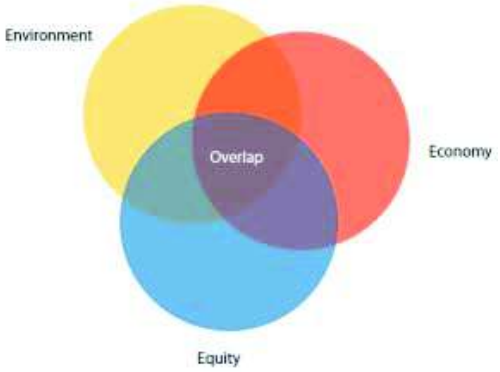

Figure 18: Sustainable Development Space

It seems apparent that within the broad confines of growth, equity and climate mitigation, the Indian government has not yet actively identified and pursued areas of overlap (Figure 18). The aggressive promotion of off -grid, rural solar-power lighting schemes, clean cook stoves, public transportation and safe infrastructure for non-motorized modes of transportation in non-metropolitan cities are but a few such examples. In addition, local environmental concerns, merit equal consideration in shifting towards an optimal development path.

Recent plans to link the National Rural Employment Guarantee Scheme with programs to promote rapid increase in forest cover are a realized example of this type of action. This would create employment for the rural poor, improve the local environment as well as create a carbon sink, and stimulate the economy by stimulating rural demand.

Now let us look into the possibilities of clean fuel options or the alternatives available for more efficient and environment friendly alternatives.

Briefly, the options are-

1) Use of efficient & cheap technology in producing electric power, fuel improvisation and alternative source of energy (e.g. solar) for transportation sector.

2) Use of R&M to reduce capital cost of efficiency increase.

3) Emphasis on clean coal technologies.

4) R&D in renewable energy with war footing priority on solar energy.

5) R&D for finding safe nuclear option.

6) Stringent norms of pollution control to boost the R&D efforts on emission control in power as well as transportation & industry.

Collator's confession: - We were not sure about the work, when we first took up the job of collating statistics and trends of the Energy Sector! As we proceeded, it was becoming increasingly difficult to cope with the entire gamut in such a short span. We tried to bring out the major issues. It is the readers, who will say whether this was an honest attempt or not! The conclusion is straightforward.

We hope to deal with all the aspects in stages, the limitations of today's developmental strategies aka R&D, coupled with the economic-socio-political issues (especially the safe nuclear other sustainable energy options) and the issue of Energy Intensity etc. in future issues and/or supplements.

Reference:-

1. Figure-1 to 11 is from World Energy Outlook 2011 by U.S. Energy Information Administration (EIA).

2. Figures shown as statistics of power sector in India are from Report on Power Sector by Ministry of Power, Govt. of India.

3. Figures on R&M are collected from Quarterly Review Report on Renovation, Modernization and Life Extension of Thermal Power Stations {1st Quarter of 2011-12, (April' – June', 2011)}.

With Best Compliments From :

A
Well
Wisher

With Best Compliments From :

A
Well
Wisher

With Best Compliments From

PAVILION CATERER

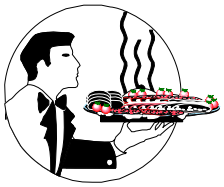

OFFICE & GODOWN:

372, EAST SINTHEE BYE LANE

KOLKATA - 700 030

MOBILE: 9831121206

With Best Compliments From :

EASTERN TUBE COMPANY

Dealers & Stockists of :

All kinds of M.S., G. I. Pipes, Conduit Pipes & Fittings,
Polythene & P.V.C. Pipes with fittings etc.

Manufacturers of :

Pipe Line Accessories & Jointing Materials

10A, Rajendra Deb Road, Kolkata - 700 007

Ph: (O) 2241 2088, (R) 3294 3701, (M) 98301 63669

With Best Compliments from:

SHREE LAXMI TUBES CO.

STOCKIST OF
G.I. Black Iron Pipe, Pipe Fitting & Seamless
E.R.W. Hydraulic Tubes & General Order Suppliers

SPECIALIST IN
Structure tube, Scaffolding Fitting & Accessories

GODOWN
201A, Muktaram Babu Street, Kolkata 700007

SALES OFFICE
12B Rajendra Deb Road, Kolkata 700007
Mobile : 98301 73234

শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

শ্রীমন্ত জুয়েলারী

১১৮, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২৩৫০-৫৭৮০

SRIMANTA JEWELLERY

118, Vivekananda Road, Kolkata-700 006

এখানে **B.I.S.**এর
"HALLMARK"
যুক্ত গহণা পাওয়া যায়।

MasterCard VISA
সমস্তরকম কার্ড গ্রহণযোগ্য

রবিবার সম্পূর্ণ ও সোমবার২-৩০ পর্যন্ত বন্ধ থাকে।

"Modernisation makes room for QUALITY *to bloom"*

- ☞ HAND-O-SCOPE (In-situ)
- ☞ PORTABLE METALLURGICAL MICROSCOPE
- ☞ UPRIGHT/INVERTED STAGE METALLURGICAL MICROSCOPES
- ☞ IN-SITU METALLOGRAPH KIT
- ☞ SAMPLE PREPARATION EQUIPMENT
- ☞ ELECTROLYTIC POLISHER / ETCHER
- ☞ REPLICA
- ☞ METALLURGICAL PHOTOGRAPHY THROUGH COMPUTER
- ☞ IMAGE ANALYSER
- ☞ EQUIPMENT FOR CHEMICAL ANALYSIS LABORATORY
- ☞ EQUIPMENT FOR SAND TESTING LABORATORY

APOLLO

APOLLO

INSTRUMENTS & EQUIPMENT

''ARYA MANSION''

6A, Raja Subodh Mullick Square, 11th Floor, Kolkata – 700 013

Phone : 2234-7969, Fax : 91-33-2225 9809

Email : apollo2@vsnl.net

We undertake commissioning of LABORATORIES on Turn-key basis

With Best Compliments From :

M/S. TARA MAA TEXTILE

61, Matri Pally
C.R. Road, Natagarh, North 24 Pgs.
Sodepur, Kolkata - 700 113
Phone : 2565-3263 & 98741 48188

With Best Wishes from:

Chowdhury Brothers

2E, Nayan Krishna Saha Lane, Kolkata - 700 003
Phone : 2555 6305, Mobile : 98305 03860/98311 63858

SPACE DONATED BY :

SHYAMA SREE TECHNOCRAFT

Mechanical Engineers

&

General Order Suppliers

66, NILMANI MALLICK LANE

HOWRAH-711 101

MOBILE : 94330 34087

Spaqce donated by:

Udayan Mondal

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Development Officer,
L.I.C. of India
College Street Branch
Kolkata-700013
Mobile : 98310 60160

With Best Compliments from:

INDUSTRIAL UTILITY ENGINEERS

(THE ELECTRICAL PEOPLE)

Office:
23, N. S. Road, Kolkata-700001
Phone: 2688-1515 (R), 2220-2049 (O)
Mobile: 9433081517

With Best Compliments From :

DUTTCON CONSULTANT ENGINEERS

115, B.K. Paul Avenue, Kolkata-700 005
Phone : 6450-3878, 2530-4667
E-mail : info@duttcon.com
Website : www.duttcon.com, ww.indiamart.com/dutton

For

- ☞ **Engineering Project Consultancy.**
- ☞ **Mechanical, Metallurgical, Electrical, Civil.**
- ☞ **Quality Control Testing, Laboratory Services, Chemical, Physical, NDT Services.**
- ☞ **Heat Treatment Services.**
- ☞ **Heavy Structural Fabrication, Erection.**
- ☞ **Gas/Oil line & Pressure Vessel Fabrication.**
- ☞ **Failure Analysis.**
- ☞ **TQM, ISO, NABL, HRD Consultancy.**

RE-ENGINEERING YOUR TECHNICAL NEEDS

With Best Compliments from:

Bengal-Earth Movers (P) Ltd.

AH 74, SECTOR-II, SALT LAKE,
KOLKATA - 700091
Phone : 033-2334 5365 / 5364
98362 35595
94325 99604
E-mail : bempi2008@yahoo.in

With Best Compliments From

W E L L
W I S H E R

Y. K. DANIYEN

With Best Compliments From :

3M
GKE

G. K. ENTERPRISE

Mfg. & Supplier of Safety & Security Equipments,
Traffic Safety Equipments,
CCTV & Signage.

86/1B, East Sinthee Road, Kolkata-700 030
Cell : 098311 11182 / 094772 52284
E-mail : gkenterprise31@gmail.com
gkenterprise31@rediffmail.com

With Best Wishes from:

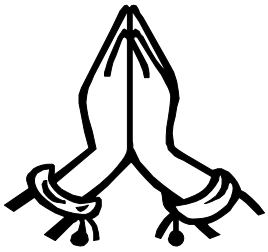

with Best Compliments from:

KAKAN PLUMBING

WATER & W.C. LINE, SANITARY FITTING, PUMP MOTOR REPAIRING

Prop. : Bijoy Paul

17/3, BARADA KANTA ROAD, KOLKATA-700 030

(LORDS GOLI)

PHONE : 2548 6273

MOBILE : 9831304318

SPACE DONATED BY :

Well Wishers

With Best Compliments From :

M/S. AUTO ENGINEERING WORKS

PALACE COMPOUND NORTH

AGARTALA; TRIPURA

With Best Wishes From :

TECHNO CRAFT

ELECTO MECHANICAL ENGINEERS & GOVT. LICENSED
(ENLISTED WITH BSNL & CPWD) CONTRACTOR

DD-38, NARAYNTALA (EAST) BAGUIATI, KOLKATA-700 059

PHONE : 033 2571 5655 MOBILE : 94330 10657

With Best Compliments From :

M/S. NEHA DISTRIBUTORS

2 / 1 / 1B MUNSHI BAZAR ROAD

KOLKATA 700 015

PHONE : 2251 4297 / 1412

MOBILE : 98832 92947

With Best Wishes from:

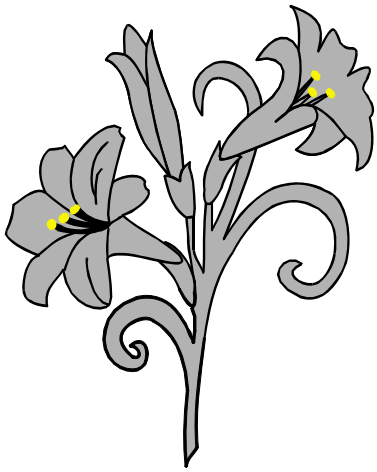

SNEHASIS SINHA

With Best Compliments From :

Genius Traders

DEALS IN : TANNING MACHINES

Hydraulic Press, Embossing Plates, Through feed Buffing, Polishing, Fleshing, Setting, Samming, Shaver Stacke, Auto Spray, Leather Area Measuring Machine, Drying Chambers.

SPARES

Pressure Dial, Temperature Dial, Heaters, Shaver Knives, Oil Seals, Boucket, Rubber ball, Springs Guns, Pump, Toggles Hooks, V. Belts, Leather Thickness Measuring Gauges.

111/E-2, Chhabelle Purwa, 150ft. Road (Opp. Asia Tannery)
Jajmau, Kanpur - 208 010
E-mail : arifgt@yahoo.com
Tele/Fax : 0512-2462135
Mobile : 09839085354

With Best Compliments From :

GORA CHAND & CO.

DEALERS & STOCKISTS OF

ALL SORTS OF FINE, HEAVY CHEMICALS ACIDS MINERALS SOLVENTS ASBESTORS AND ALL KINDS OF MARINE STORE

SUPPLIERS

GOVT. RLY., AND GENERAL ORDER SUPPLIERS

OFFICE & SHOWROOM

22, BONFIELD LANE, KOLKATA-700 001

OFFICE : 2210 4518

SHOWROOM : 2242 9658

MOBILE : 98311 55528

With Best Compliments From :

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Biswajit Guha

Mobile : 9804549550 / 9477165866

Agent. Life Insurance Corporation of India

C/O. ANIRBAN SENGUPTA
114/2, DAKSHINPARA ROAD, DUM DUM
P.O. BANGUR, KOLKATA - 700 055

With Best Compliments From

DAS ENTERPRISE

ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERS
GOVERMENT CONTRACTOR

228A, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD
KOLKATA - 700 004
PHONE : 2555-2742, (RESI.) 2577-1972
MOBILE: 98302 40615, 94334 11604
E-MAIL : susanta187b@gmail.com

With Best Wishes from :

ESBEE

ESBEE

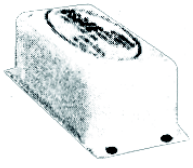

23, Barada Avenue, Garia
Kolkata - 700 084
Phone : 98306 17891 / 98740 45887

With Best Compliments from:

Vikash Metal & Power Ltd.

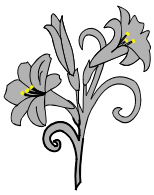

35, CHITTARANJAN AVENUE
KOLKATA - 700 012

SPACE DONATED BY :

SOUMITRA ROY

With Best Compliments from:

Niranjan Chakrabarty

With Best Wishes from:

AT YOUR SERVICE SINCE 1988

ALCHEMIST

.....building a Golden tomorrow.....

Business Contact
98301 85414 / 92391 56906

(SOMA SARKAR)
Email : sarkaranurag8@gmail.com

SPACE DONATED BY :

A

Well

Wisher

With Best Compliments from.

STORES SUPPLY CORPORATION

EVERYTHING IN ELECTRICALS

Authorised Dealer:

HAVELLS Crabtree

32, EZRA STREET, GROUND FLOOR
(Shop No. 60) KOLKATA - 700 001
Phone : 3985-1949 / 98305 91440
Telefax : 2235-8050
E-mail : ksurana57@yahoo.com

With Best Compliments From :

M/S. DEEPALI CONSULTANCY

PROP. SANJAY BANIK

MOBILE : 93310 45078

With Best Wishes from :

M. B. ENTERPRISE

RADIOGRAPHY INSPECTION

STRESS-RELIEVING

PRE-HEATING

ULTRASONIC TEST

ULTRASONIC THICKNESS GAUGE TEST

MAGNETIC PARTICLE TEST

DYE PENETRATION TEST

20B, JOYNARAYAN BANERJEE LANE
(NEAR BARANAGORE KUTHIGHAT)
KOLKATA - 700 036
PHONE : 2546-0898 (R), 2531-1983 (O)
MOBILE : 9830073726

With Best Compliments From :

Kundu Transport

39/2, CANAL WEST ROAD

KOLKATA-700 004

MOBILE : 9331751826

With Best Compliments From :

M/S. NEW SREE DURGA MOTORS

TATA MOTORS - SPARES PARTS DEALER

PROP. SACHIN GHOSH

MOBILE NO. 98300 72191

AMTALA
DIAMOND HARBUR ROAD
(SOUTH 24 PRGS.)

With Best Compliments From:

P **Precision Parts**

House of Hi-tech Equipment and Spares
[Formerly : Precision Parts]

Registered Office:

37, Ghosh Lane, Kolkata-700 006 W.B. India
Phone : 91-33-2360-8872, 2360-5519
Fax : 91-33-2360-5519
E-mail : pp_37g@yahoo.com

Space donated by:

Deepak Yadav & Arnab Roy
Jt. Secretary

SHAHRUKH KHAN FANS CLUB

Approved by
RED CHILLIES ENTERTAINMENT

Mob. : 98303 60425, 98304 36793
E-mail : dk_deepak84@rediffmail.com

MEMBERSHIP OPEN

With Best Wishes from:

S. R. ELECTRO TEC ENGINEERS

MANUFACTURING OF :

Various type of Electrical Control Panel & Instrument Control Panel
AMF, MCC, MCB DB, P.D.B. Bus Duct Repairing Erection & Commissioning

FACTORY & OFFICE
4, Tangra 2nd Lane, Kolkara - 700046

Phone : 6548-6575
Mobile: 97484 35867
E-mail : amitnarayan05@gmail.com

With Best Compliments from:

NITAI KUNDU

TOUR OPERATOR

Mobile : 98302 10987

With Best Compliments From :

MAA BABA ENTERPRISE

TAX CONSULTANCY
9831235186

18, N. S. ROAD
KOLKATA-700 001

অ্যাম্বুলেন্স ও শব্‌বাহী গাড়ীর জন্য

২৪ ঘণ্টা

জরুরী পরিষেবা

যোগাযোগ করুন ঃ

৯৮৭৪৯ ৫৮৩৬৪

৯৮৩৬৮ ০৪৪৪৪

৯৮৭৪৮ ০৭৭৭৭

★ মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদানে এবং দুঃস্থ মানুষের জন্য বিশেষ সহায়তা

উদ্দীপন

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

পড়ুন ও পড়ান

ঠিকানাঃ ৩/২এ, ডাফ লেন, কলকাতা-৬

দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৩৫০ ৪৪০৩

চলমান ঃ ৯৪৩৩০৯৯৯০৩

৯৪৩৩১৫২১২৫

With Best Compliments From :

Mahadev Enterprise

GOVT. LICENSED ELECTRICAL, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR

D

76, CRIPER ROAD, P.O. : KONNAGAR
DIST. : HOOGHLY, PIN CODE 712235
PHONE : 2674 3099
MOBILE : 94330 43099

With Best Wishes from:

Tapan Kumar Dey

Govt. Electrical, Mechanical, Civil Contractor & General Order Suppliers

NAMO PARA, RATH TALA,
P.O. & DIST. : PURULIA (W.B)
PHONE : 224787
MOBILE : 94341 30349

অ্যাম্বুলেন্স ও শব্‌বাহী গাড়ীর জন্য

২৪ ঘণ্টা

জরুরী পরিষেবা

যোগাযোগ করুন ঃ

৯৮৭৪৯ ৫৮৩৬৪

৯৮৩৬৮ ০৪৪৪৪

৯৮৭৪৮ ০৭৭৭৭

★ মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদানে এবং দুঃস্থ মানুষের জন্য বিশেষ সহায়তা

উদ্দীপন

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

পড়ুন ও পড়ান

ঠিকানাঃ ৩/২এ, ডাফ লেন, কলকাতা-৬

দূরভাষ ঃ ০৩৩-২৩৫০ ৪৪০৩

চলমান ঃ ৯৪৩৩০৯৯৯০৩

৯৪৩৩১৫২১২৫

With Best Compliments from:

D

B. Manjhi

SPACE DONATED BY :

A WELL WISHER

STUDYING IN CLASS XI SCIENCE?

DREAM TO BECOME AN ENGINEER

FROM ONE OF THE IITS

OR

FROM A VERY REPUTED ENGINEERING

INSTITUTION IN THE COUNTRY

and

SCORE BRILLIANTLY IN YOUR BOARD EXAMS

NOT GETTING PROPER GUIDANCE?

JOIN *PhyMatH*

CALL 9330959470 / 24143703

Visit : www.phymath.com

1ST RANK HOLDER IN WBJEE (1986) &
IIT KANPUR ELECTRONICS ENGINEER
TEACHES BOTH PHYSICS & MATHS

SPACE DONATED BY :

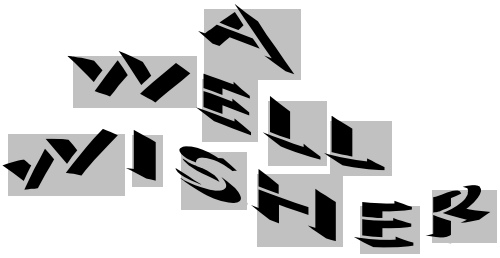

With Best Compliments from:

SURAKSHA
HOSE

ITCO IMPEX LTD.

PADMASHREE
LPG STOVE

65, ARVIND SARANI, KOLKATA-700 005

PHONE : 2555-4849/8272

With Best Compliments

A
WELL
WISHER

Space Donated by

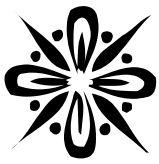

A Well Wisher

NEED OF THE HOUR.....COST REDUCTION WITH INCREASED PRODUCTIVITY

With Best Wishes from

ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

(An ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004 Certified Company)

WORLD CLASS PRODUCER OF
DUCTILE IRON SPUN PIPES AND FITTINGS

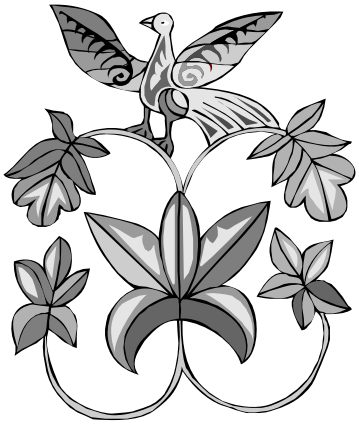

KHARDAH WORKS

Phone No. 4405 8300

Fax No. 4405 8501, 4405 8502

SPACE DONATED BY :

ZEETS EXPO INDIA

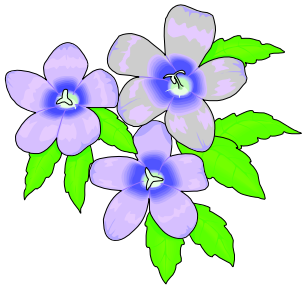

MASLANDPUR, VILL. : UTTAR CHATRA
P.O.: CHATRA, NORTH 24 PARGANAS

SPACE DONATED BY :

S. M. ENTERPRISE

Govt. Contractor

Specialist in
Interior Decorating
Furniture Repairing
& General Order Suppliers

60, BENTINCK STREET, ROOM 1
1ST FLOOR, KOLKATA-700 072

Complements from

BHATTACHARYA ENTERPRISE

KALYAN NAGAR COLONY (BARMA)
P.O. JOKA, KOLKATA-700 104
M. N. 98747 54575 / 94334 56081

With Best Wishes from:

ALCHEMIST Since,1988

Abhishek Biswas Barman
(INVESTMENT ADVISOR)

PLEASE CONTACT FOR MATURITY AND INVESTMENT

MOBILE : 89812 46514 / 92397 87265

Regional Office :
H. M. Building, 4th Floor, 15, Ganesh Ch. Avenue, Kolkata
Visit us at : www.alchemist.co.in

Residence:
50B, Madhu Roy Lane, Kolkata-700 006

Space Donated by

A WELL WISHER

With Best Compliments From :

A WELL WISHER

With Best Compliments From :

M/S. BESTCON

DEVELOPERS, ENGINEERS & CONTRACTORS

15A, MAHESH BHATTACHARYA SARANI

KOLKATA - 700006

PHONE : 98300 15704 / 98300 59907

With Best Wishes from:

GPT INFRA PROJECTS LTD.

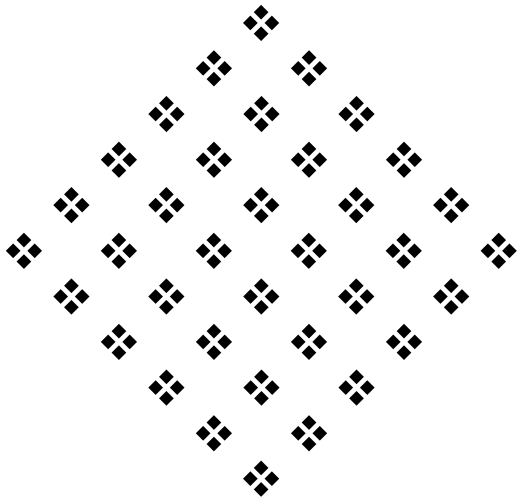

BANDWAR, NEAR DURGABARI,
UDAIPUR
TRIPURA (SOUTH)

With Best Wishes from :

M/S. SUBHRA ENTERPRISE

Specialist in

INTERIOR DECORATING,

FURNITURE REPAIRING

&

GENERAL ORDER SUPPLIERS

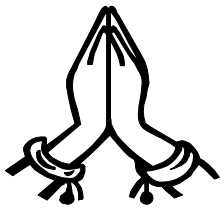

BAISHALI, THAKURANI CHAWK

SAMABAYA PALLY, BALLY

HOWRAH - 711 205

ব্যতিক্রমি ভ্রমণ-এর জন্য ব্যতিক্রমী ভ্রমণসংস্থা

পর্যটক

এল.টি.সি / এল.এফ.সি স্বীকৃত

প্যাকেজ ট্যুর হোটেল বুকিং গাড়ি ভাড়া শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সফরসূচী ও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

৩৬ সি ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০০৪

(শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ের কাছে - বি.এস.এন.এল. অফিসের বিপরীতে)

৯৮৩০২ ২৬৩৫৭ / ৯৪৭৭০ ২৪৮৩০ / ৯৮৩০২ ৪৮৫৪৪ / ৯৮৩৩১ ১৯৯৮৫

ই-মেল : paryatak_sc@ymail.com ওয়েব সাইট : www.paryatak.info

With Best Compliments From :

DRS Tech

(Government Registered SSI Unit)

73, Raja Road, Sukchar, Kolkata-700 115

Phone : 2553-3076 / 2523-1902, Telefax : 2583-2977

E-mail : drstech07@gmail.com

- ☞ Computerisation of School, University
- ☞ Municipalities, Government Offices
- ☞ Software Development
- ☞ Website Development
- ☞ Hardware, Networking & Maintenance
- ☞ Computer Training

INTEGRATED COMPUTER SUPPORT GATEWAY TO IT CAREER

With Best Wishes from :

M/S. KRISHNA TRADERS

KAKURGACHI

KOLKATA

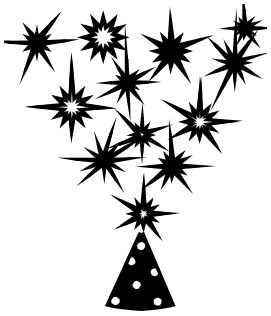

মরণোত্তর দেহদান - চক্ষুদান ও শববাহী গাড়ির জন্য যোগাযোগ করুন

যোগাযোগ :

উত্তর কলকাতা উদয়ের পথে

৯৮৩০১ ৭৩৮১৪

৯৮৩০৭ ৫০৯৬০

(০৩৩) ৩২৫০ ১০৮৯

স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন

প্রতি বছর আমাদের রক্তদান শিবির

মে মাসের **শেষ** অথবা **জুন** মাসের **প্রথম রবিবার** এবং **বিজয়া দশমীর** দিন।

With Best Wishes from:

BAC EQUIPMENTS

D-85, 1st Floor, St. No. -4, Laxmi Nagar, Delhi-110092

Ph. : 011-22011221 Fax : 22456869

Mob. : 09472368666, 09939048111

E-mail : bacequipments@hotmail.com

bacequipments@engineer.com

Branch Office:

Kishun Nagar Cold Storage Campus

P.O. Kanti, Dist. - Muzaffarpur - 843109

Tel. : 06223 -266203, 0621-3200760

(M) 09308619211, 09334206226, 09304834200, 09771271578, 09308633401

With Best Compliments From

R. M. GLOBAL ENTERPRISES

DEALS IN

ALL TYPES OF HEAVY EARTH MOVING EQUIPMENTS, CONTRACTOR, BUILDING MATERIAL & GENERAL ORDER SUPPLIERS

BLOCK A/3, GROUND FLOOR, PRASADNAGAR

27, B. T. ROAD, KAMARHATI

KOLKATA-700058

PHONE NO. 033-25235837

MOB. NO. 9830587870, 9830114870, 9038108209

EMAIL ID : RMGLOBALENTERPRISES@YAHOO.CO.IN